দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৮ বর্ষ, ৫১ সংখ্যা।। ১৭ আগস্ট, ২০২৬।। ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

ভারতকে অশান্ত করার ষড়যন্ত্র

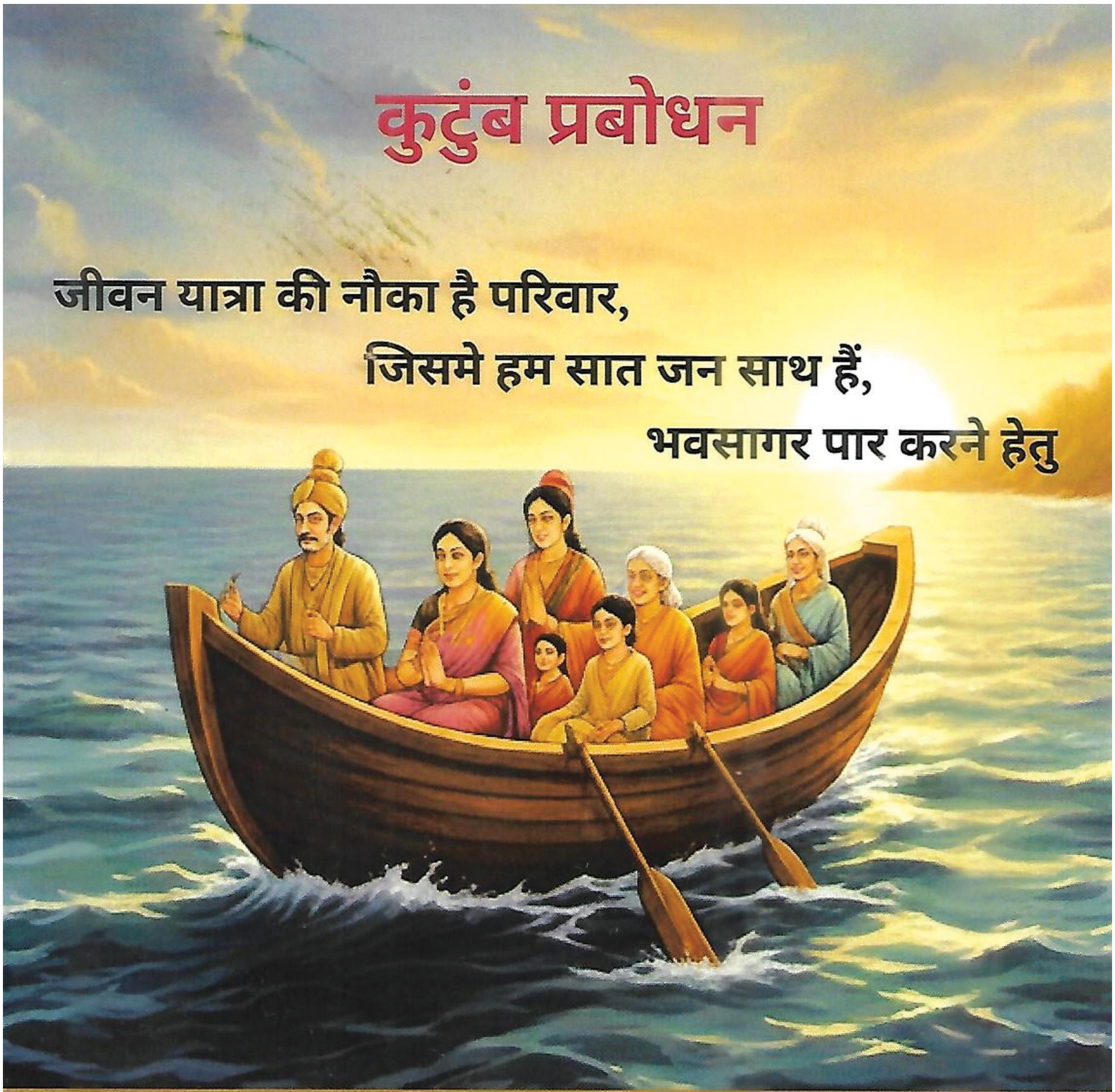

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৫১ সংখ্যা, ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

১৭ আগস্ট - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

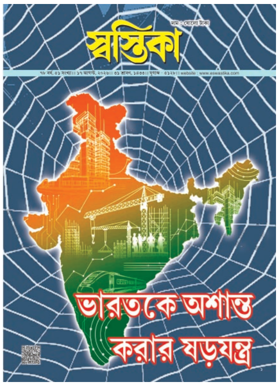

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

নতুন সরকারের ভাবনা রাজ্যের তথাকথিত মেধাবীদের নাগাল ছাড়িয়ে : ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

রয়্যাল দিদির রয়্যালিটি ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

তসলিমা নাসরিন : ফিরে দেখা, নতুন কথা

◻ ড: রাকেশ দাশ ◻ ৮

নব্য-সাম্রাজ্যবাদ : রেজিম চেঞ্জ ও ভারতের ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১১

'বন্দে মাতরম্'-এর আইনি মর্যাদা ও জাতীয় সম্মান রক্ষার নতুন অধ্যায় ◻ ধর্মানন্দ দেব ◻ ১৪

ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জাতীয় অখণ্ডতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ

◻ ড: বলরাম দে ◻ ১৭

খনার বচন এবং বঙ্গের মৌখিক সাহিত্যের ধারা

◻ ড: সুশান্ত মজুমদার ◻ ৩১

মহাভারতীয় রান্নাবান্না : রাজা নলের তৈরি মাংসান্ন

◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩৩

বাংলাদেশে গত ছ'মাসের সাম্প্রদায়িক হিংসার তথ্য প্রকাশ করেছে ঐক্য পরিষদ ◻ বিশেষ প্রতিনিধি ◻ ৩৫

ভারতকে অশান্ত করার ষড়যন্ত্র : বৈদেশিক মদতের চিত্রনাট্য

◻ অর্ণব কুমার দে ◻ ৩৭

ছাত্র আন্দোলনের আড়ালে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির আস্ফালন দেশের পক্ষে বিপজ্জনক ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ৪৩

ককরোচ আন্দোলনের বাস্তবতা : শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের নেপথ্যে অপরাধ ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের চোরাস্রোত

◻ কে এ বদরিনাথ ◻ ৪৬

গল্প কথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ :

◻ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ ◻ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ খেলা : ৪৮

প্রকাশিত হবে
২৪ আগস্ট
২০২৬

স্বস্তিকা

সামাজিক সম্প্রীতির উৎসব রাখিবন্ধন

রাখিবন্ধন শুধুমাত্র ভাই-বোনের পবিত্র সম্পর্কের উৎসব নয়। সামাজিক সম্প্রীতি, সমরসতা, ঐক্য ও মৈত্রীর এক পরম্পরাগত উৎসব। সমস্ত রকম ভেদাভেদ ভুলে একে অপরকে, এমনকী দেশরক্ষার বার্তাও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে।

স্বস্তিকায় আগামী সংখ্যায় রাখিবন্ধনের বিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক

প্রকাশিত হবে
২৪ আগস্ট
২০২৬

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে উনআশি বর্ষ পূর্ণ করতে চলেছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দেশকে অশান্ত করিবার চক্রান্ত

বিশ্বের একমাত্র শান্তিপ্রিয় দেশ ভারতবর্ষ। যে দেশ মানব কল্যাণে উচ্চারণ করিয়া থাকে 'সর্বে ভবন্তু সুখীনঃ সর্বে সন্তু নিরামযাঃ'; যে দেশ সমগ্র বিশ্বকে একটি পরিবার মনে করিয়া থাকে— বসুধৈব কুটুম্বকম্; যে দেশ সমগ্র বিশ্বকে জ্ঞান-বিজ্ঞান অকাতরে দান করিয়াছে, সেই দেশকে কেন বারবার অশান্ত করা হইয়া থাকে? বিশ্ববাসী অবগত রহিয়াছেন, ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল হইতেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসাবাণিজ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উন্নত সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পরিপুষ্ট। তাই সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক শক্তিগুলির লোলুপ দৃষ্টি বরাবর ভারতবর্ষের উপর। ভারতবর্ষকে দুর্বল করিবার জন্য তাহারা বার বার আক্রমণ করিয়াছে, লুণ্ঠন করিয়াছে। এই আক্রমণের ধারাও দীর্ঘ। শক, হুন, পাঠান-মোগল, তাহার পর ওলন্দাজ, ফরাসি, পর্তুগিজ এবং সবশেষে ইংরাজ ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন করিয়াছে। চতুর ইংরাজ বণিকের ছদ্মবেশে আসিয়া শাসন ক্ষমতা দখল করিয়াছে। ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন, ভারতবর্ষ একসময় বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বে বিশ্ব জিডিপি-র প্রায় ২৩ শতাংশ অংশীদার ছিল ভারতবর্ষ। এই বিপুল ঐশ্বর্যের কারণেই বার বার বৈদেশিক হানাদারের কুনজর পড়িয়াছে ভারতবর্ষের উপর। শাসনের নামে তাহারা এই দেশকে লুণ্ঠন করিয়াছে। তাহাতেই তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই। মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবির সমর্থনে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিয়াছে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার ভারতবাসী লাভ করিবার পরও তাহাদের কুদৃষ্টির পরিবর্তন হয় নাই। দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের কারণে স্বাধীন ভারতকেও তাহারা বারবার অশান্ত করিয়াছে। দেশের ভূখণ্ডে অবলীলায় তাহারা অনুপ্রবেশ করিয়াছে। বন্ধুর ছদ্মবেশে কেউ ভারতের ভূমি জবরদখল করিয়াছে। দুর্বল ভারত সরকার তাহার প্রতিবাদ করিবার সাহসটুকু দেখাইতে পারে নাই।

ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে ২০১৪ সালে ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন হইয়া স্বাভিমানী, শক্তিশালী দেশভক্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সরকারের সুশাসনে সর্বক্ষেত্রে দেশ অগ্রগতির পথে চলিতে শুরু করিয়াছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সামরিক সরঞ্জামের আধুনিকীকরণ ঘটাইয়াছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংকটে ভারতের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ এবং গ্লোবাল সাউথের নেতৃত্বদানের ক্ষমতা লাভ করিয়াছে বর্তমান ভারত। এই সমস্ত কারণেই বিশ্বের তথাকথিত ক্ষমতাধর দেশগুলির ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ পরিবর্তন হইয়াছে। তাহার জন্যই তাহারা নানাভাবে নূতন পদ্ধতিতে ভারতকে অশান্ত করিবার পরিকল্পনা শুরু করিয়াছে। বিশ্বব্যাপী মন্দার মধ্যেও ভারতের ক্রমবর্ধমান বিকাশকে স্তব্ধ করিতে না পারিয়া তাহারা ভারতের অভ্যন্তরে সক্রিয় দেশবিরোধী শক্তিকে বিপুল অর্থের প্রলোভনে বশে আনিয়াছে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের হইল, দেশের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলিও সেই বৈদেশিক শক্তির দাবার বোড়ে হইয়া ভারতকে দুর্বল কবিবার খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে। ২০১৪ সালের পর হইতে তাহারা আরও সক্রিয় হইয়াছে। ভারতের অগ্রগতি কোনোভাবে রুদ্ধ করিতে না পারিয়া তাহারা দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করিবার জন্য, প্রশাসনিক ব্যবস্থা অচল করিবার জন্য তরুণ প্রজন্মকে হাতিয়ার করিয়াছে। শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও বাংলাদেশের ন্যায় ভারতের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা করিতেছে। কখনো কৃষক আন্দোনের নামে, কখনো সিএএ বিরোধী আন্দোলনের নামে। সম্প্রতি দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলনের নামে বৈদেশিক শক্তির ক্রীড়নক হইয়া দেশের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা সমগ্র দেশ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। দেশবাসীর সৌভাগ্য যে, ভারত সরকার অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত তাহার মোকাবিলা করিয়াছে। কিন্তু ইহার পরও তাহারা নূতন নূতন বাহানায় দেশকে অশান্ত করিবার খেলা শুরু করিবে, তাহাও নিশ্চিত করিয়া বলা যায়। যে পশ্চিমবঙ্গ এতদিন দেশবিরোধী শক্তিগুলির খোলা ময়দান ছিল, তাহার রাজনৈতিক পালাবদল হইয়া দেশভক্ত সরকার প্রতিষ্ঠা হইবার কারণে তাহারা ঘরে-বাহিরে দুই দিকেই ভারতকে অস্থির করিবার খেলায় মাতিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। এমতাবস্থায় দেশি-বিদেশি দেশ বিরোধী, রাষ্ট্র বিরোধী শক্তির নূতন নূতন চক্রান্ত হইতে দেশভক্ত নাগরিকদিগকে সাবধান থাকিতে হইবে।

সুভাষিতম্

প্রিয়োভবতি দানেন প্রিয়বাদন চাপরে।

মন্ত্রমূলবলেনান্যো যঃ প্রিয়ঃ প্রিয় এব সঃ।। (বিদুরনীতি)

অর্থ ঃ কোনো কিছু দান করার কারণে কেউ প্রিয় হয়, প্রিয় বাক্যের কারণে কেউ প্রিয় হয়, কোনো মন্ত্রবলে (উত্তম ভাবনা)-র কারণে কেই প্রিয় হয়, কিন্তু স্বভাবগত যে প্রিয়, সেই-ই প্রকৃত প্রিয়।

নতুন সরকারের ভাবনা রাজ্যের তথাকথিত মেধাবীদের নাগাল ছাড়িয়ে

ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

যা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ নয় তার অস্তিত্ব নেই মনে করেন ইন্দ্রিয় নির্ভর দার্শনিকরা। তাঁদের কাছে ইন্দ্রিয়নির্ভর জ্ঞান হলো প্রকৃত বা আসল জ্ঞান। ন্যায়দর্শন বলে--- ‘ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নম জ্ঞানং অব্যাপদেশ্যম অব্যাভিচারী ব্যবসায়াত্মাকং প্রত্যক্ষং’। রাজ্য জুড়ে এই মুহূর্তে একটাই কথা ‘ভারতীয় জনতা পার্টি কেন তস্কর দলের সাংসদ আর বিধায়কদের দলে নিচ্ছে? কেন-বা ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস আর জাভেদ খানদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না?’ প্রশ্নটা হবে সনাতনীরা এদের নিয়ে কেন রাজনীতি করবে? রাজনীতির কোনো সোজা পথ নেই। সেখানে বাধ্যবাধকতা যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে আদর্শ আর গালভরা অহংকার। ধরে নেওয়া হয় অহংকার তার থাকে যিনি আদর্শ মেনে চলেন। তবে মনে রাখা দরকার, ঝড়ে সোজা গাছ আগে কাটা পড়ে। তাই সাংসদদের বিষয়টি জাতীয় রাজনীতির অঙ্গ। বিদেশি পুঁজি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন ছাড়াও এক দেশ-এক ভোট, ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে সংসদে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি আর মহিলা বিল পাশ করাতে গেলে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। লোকসভায় ৩৬০ ও রাজ্যসভায় ১৬৪ জন সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন।

ইতিমধ্যেই বিজেপি দল এরাজ্যে ২৫০ জনকে চিহ্নিত করেছে তোলাবাজি বা দল বিরোধী কাজের জন্য। বহিষ্কার করেছে প্রায় ২৫ জনকে। এ রাজ্যে দল থেকে বড়ো নেতাদের বহিষ্কারের প্রথা প্রায় সাত দশক ধরে উঠে গিয়েছিল। তা আবার ফিরে আসছে। তাতে সাধারণ মানুষের যত স্বস্তির কারণ হয়েছে বাকিদের অস্বস্তি বেশি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তাতে এই রাজ্যের টুলো পণ্ডিতরা ফাঁপরে পড়েছেন। আগের তস্কর সরকারের চোরদের ধরতে গিয়েই দু'মাস কেটে গিয়েছে। তাই ১৮৮০ দিন ধরে যে সরকারের চলার কথা তারা প্রথম ৬০ দিন কেবল চোর ধরতে, চোর তাড়াতেই সময় কাটিয়ে ফেলেছে। উপায় কী? ১৫ বছর ধরে তস্করদের দল রাজ্যের মানুষকে যেভাবে ঠকিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে তার সাম্প্রতিক বড়ো দু'ই উদাহরণ হুগলীর তস্কর দলের এক মুসলমান নেতার বিরুদ্ধে আর দক্ষিণ কলকাতার এক মাফিয়া নেতার বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ এনেছিল তা তারা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কেন? কেউ জানে না। ফলে এনআইএ-র মতো সংস্থাকে পিছিয়ে আসতে হয়েছে।

লক্ষণীয় যে, অনুপ্রবেশ আর উদ্বাস্তু সমস্যা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। তস্কর সরকার জেহাদিদের এখানে স্থান দিয়েছিল। তাদের ভিতর আনুমানিক ৪ হাজার অনুপ্রবেশকারীকে মোল্লাবাদী বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। যদিও সেখানে এখন একটি নির্বাচিত সরকার তৈরি হয়েছে। তবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ওয়াজেদ দেশে না ফেরা পর্যন্ত তা বোঝা যাবে না।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি পরিচালিত নতুন সরকারের জমানায় পথচারীদের জন্য ফুটপাত, রেলপথ আর রেলের প্ল্যাটফর্ম উন্মুক্তকরণে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে রাজ্যে নতুন করে শিল্প আনার ভাবনা তার থেকে আলাদা কিছু নয়। উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কনস্ট্রাকশন সিন্ডিকেট বা নির্মাণ শিল্পে মাফিয়ারাজ ধ্বংস করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গুন্ডা দমন আইন এখনও কার্যকর হয়নি বলে একশ্রেণীর বাজারি সংবাদপত্রে যা লেখা হচ্ছে ঠিক তার বিপরীতটাই ঘটছে রাজ্যের নতুন জমি নীতি তৈরি নিয়ে। এ লেখা প্রকাশ হওয়ার আগেই রাজ্যের নতুন শিল্প নীতি— ‘উত্তরণ ২০২৬’ বা ‘ডেভেলপমেন্ট পশ্চিমবঙ্গ’ ঘোষিত হবে। তাতে নতুন চমক যে আদৌ থাকবে তা বলা না গেলেও এটা স্পষ্ট যে আনুমানিক ৮ লক্ষ কোটি টাকার ঋণভারে জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে খুব বড়ো কোনো শিল্প নিবেশের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় যদিও টাটা শিল্প গোষ্ঠী আবার নতুন করে এ রাজ্যে ফিরে আসার কথা ভাবছে। শিল্প মন্ত্রী তাপস রায়ের মতে শিল্প ভাবনা নতুন ভাবে তৈরি হচ্ছে বলেই আমুল আর মিৎসুবিশির মতো কোম্পানি এখানে আসার কথা হচ্ছে। তার সঙ্গে রয়েছে বেশ কিছু ছোটো শিল্প গোষ্ঠী যারা পাট কিংবা চা শিল্পের মতো চিরাচরিত শিল্পগুলিকে গড়ে তুলতে চাইছেন। ২০০৮ সালে টাটা গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গকে বয়কট করে চলে যাওয়ার পর থেকে এই রাজ্যে ‘শিল্প খরা’ শুরু হয়।

এক ধরনের গভীর অবিশ্বাস রাজ্যের শিল্প পরিবেশে চেপে বসে। এর পোশাকি নাম ‘ট্রাস্ট ডেফিসিট’ বা অবিশ্বাসের পরিবেশ। ২০১৩ থেকে তস্কর সরকার শিল্প সার্কাস করত। নিট ফল ১.০৩ শতাংশ শিল্প নিবেশ। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হতেই পারে, তবে এবার বোধহয় শিল্পে কুমির ছানার রাজনীতি বন্ধ হবে। যে ৫ শতাংশ ঠগের দল বিজেপি তে ভিড়েছে তাদের নিকেশ হবে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

রয়্যাল দিদির রয়্যালিটি

অহঙ্কারীষু দিদি,

আপনার একটি মন্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্কের আবহ তৈরি হয়েছে। আপনি অভিযোগ করেছেন, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত বই বিক্রির রয়্যালটির টাকা পাননি। এই ঘটনার পিছনে বিজেপির ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলেও ইঙ্গিত করেছেন। বরাবরই আপনি দাবি করেছেন, আপনার বই বিক্রির রয়্যালটির অর্থই আপনার ব্যক্তিগত খরচের অন্যতম ভরসা।

আপনি বলেছেন, 'আমি মাইনা নিতাম না। এক পয়সা পেনশনও নিই না। দীর্ঘদিন ধরে আমি বই লিখি। এবং সেই বই বিক্রির রয়্যালটি থেকে যে অর্থ আসে, তা থেকেই আমার চলে। কিন্তু এ বছর এখনও পর্যন্ত সেই টাকা আমি পাইনি। নিশ্চয়ই বিজেপির ভয়ে সব চুপ করে বসে আছে। নিশ্চয়ই এর পিছনে ওদের কোনো খেলা আছে।' এ কি মারাত্মক কথা! বিজেপি আপনার রোজগার বন্ধ করে দিয়েছে। ভাই ভাইপোদের করেছে জানতাম কিন্তু আপনারও! এই মন্তব্য সামনে আসতেই প্রতিক্রিয়া দেন দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার সুধাংশুশেখর দে। আপনার লেখা বড়ো সংখ্যক বইয়ের পাবলিশার তো দে'জ পাবলিশিং। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, রয়্যালটির অর্থ দেওয়া নিয়ে কোনো জটিলতা বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট সময়েই রয়্যালটির টাকা পাঠানো হয় এবং এবারও সেই নিয়ম মেনেই অর্থ পাঠানো হবে। কোনো রাজনৈতিক চাপে টাকা দেওয়া হচ্ছে না, এই অভিযোগ ঠিক নয়। প্রতিবছরই জুন মাসের পর থেকে রয়্যালটির টাকা দেওয়া হয়। এটি নিয়মিত আর্থিক প্রক্রিয়ার অংশ। একে একে সবাই পাচ্ছেন। তিনিও পেয়ে যাবেন।

কিন্তু দিদি আপনি পাবেন না। এই বছর টাকা পেলেও আর পাবেন না। কেন পাবেন না সেটা বলার আগে বলি কেন পেতেন।

আপনার মোট বইয়ের সংখ্যা দেড়শোরও বেশি। ক্ষমতায় থাকাকালীন প্রতি বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় নতুন নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি স্কুল ও লাইব্রেরিগুলিতেও বাধ্যতামূলক ছিল। তাই রয়্যালটির পরিমাণ নেহাত অল্প নয়। কেউ না পড়লেও সবাইকে কিনতে হয়। আর এই বই জোর করে গছিয়ে দিয়ে নিজেদের অন্য বই ইচ্ছামতো দেওয়ার ছাড় পেয়ে যেতেন প্রকাশকেরা। এমনটাই অভিযোগ।

মনে পড়ছে ২০২২ সালে সেই পার্থ চ্যাটার্জির বান্ধবীর বাড়িতে যখন কাড়ি কাড়ি টাকা পাওয়া গেল তখন অনেকে বলছিল, ওগুলো আপনারাই টাকা। তখনই নজরুল মঞ্চে বঙ্গ বিভূষণ অনুষ্ঠানে আপনি বলেন, 'আমি কারও পয়সায় খাই না। রেলমন্ত্রী যখন ছিলাম নিজের পয়সায় চা খেতাম। এখনও সার্কিট হাউসে গেলে তাই করি।' মানে আপনি সৎ এটা প্রমাণ করতেই আপনি বলেছিলেন, 'আমি বই লিখি, খেটে রোজগার করি। ১২০টি বই বেরিয়েছে। আমি গানে সুর দি, কারও পছন্দ হতেও পারে নাও হতে পারে। কিন্তু তাতে রয়্যালটি পাই। আমি যা রয়্যালটি পাই, তা অনেকেই পায় না।' এই যে কথাটা সেটা কিন্তু সত্যি ছিল দিদি। কারণ, সরকারি পয়সায় বই কিনে রয়্যালটি বাবদ বিপুল আয় করেছেন। কিন্তু আর তো সেই মিথ্যা চলবে না। বই গছিয়ে দেওয়া যাবে না। কোনো স্কুল, লাইব্রেরি নেবে না। মিথ্যা অহংকার শেষ। কেউ পড়বে না। আর কেউ ছাপবেও না।

> **সরকারি পয়সায় বই কিনে রয়্যালটি বাবদ বিপুল আয় করেছেন। কিন্তু আর তো সেই মিথ্যা চলবে না। বই গছিয়ে দেওয়া যাবে না। কোনো স্কুল, লাইব্রেরি নেবে না। মিথ্যা অহংকার শেষ। কেউ পড়বে না। আর কেউ ছাপবেও না।**

আরও একটা কথা দিদি, পশ্চিমবঙ্গে একজন লেখকের শুধু রয়্যালটির উপর নির্ভর করে সংসার চলে কি? খালি আপনার চলে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে জয় গোস্বামী সবাই কিন্তু অন্য কাজ করে সংসার চালাতেন। ব্যতিক্রম দু'একজন আছেন সমরেশ বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো। তবে তাঁদের বই বিক্রিও ছিল মারাত্মক। তাঁদের লেখা নিয়ে সিনেমাও হয়েছে। কিন্তু আপনি! কী লিখেছেন! তাহলে আর কেউ এত রয়্যালিটি কামায় না বলে অহঙ্কার কেন। এটাই আপনার কাল। এখন সরকার গেছে, দলও গেছে শুধু অহঙ্কারের জন্য।

আচ্ছা গান লিখে, সুর দিয়ে যে রয়্যালিটি পেতেন সেটাও কি বন্ধ হয়ে গেছে নাকি! তাহলে কিন্তু আমাদের সকলের এবারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কল্যাণ তহবিলে টাকা দেওয়া উচিত। ফি বছর, পূজায় আপনি গান লিখতেন, সুর দিতেন। সুজিত ভাই সেই গান অনেক টাকায় কিনতেন। অরূপ ভাই, পার্থ ভাইয়েরা কিনতেন। আর কিনবেন নাকি তাঁরা! আপনার গান ছাড়া মা দুর্গার আগামনী কী করে হবে! □

তসলিমা নাসরিন

ফিরে দেখা, নতুন কথা

ডঃ রাকেশ দাশ

১৯৯২ সাল। ৬ ডিসেম্বর। অযোধ্যায় বিতর্কিত, ভগ্নপ্রায় ধাঁচা ভাঙা পড়ল। বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ হিন্দু গণহত্যা, গণধর্ষণ, লুঠতরাজের শিকার হলেন। লক্ষ লক্ষ হিন্দু কাঁটাতার, নদী, নালা পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে উঠলেন। ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো।

আমার বাবা অজ্ঞাতবাসে। সঙ্ঘের প্রচারকরা অজ্ঞাতবাসে। কখনও কখনও নিশুতি রাতে ১১টা-সাড়ে ১১টায় গভীর অন্ধকারে জানলায় টোকা পড়ে। ঝিঁঝি পোকার ডাকের সঙ্গে মিশে ফিসফিসে গলায় ডাক আসে— 'বৌদি, দরজাটা খুলুন। আমি অমুক।' বিদ্যুতের আলো না জ্বেলে মোমবাতি জ্বেলে সন্তর্পণে গেটের তালা খুলে চুপিসাড়ে ঢোকানো হয় সঙ্ঘের কোনো কার্যকর্তা বা প্রচারককে। এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলেছে। প্রায় ৬ মাস। বাবা অবশ্য বাড়ি ফিরেছিলেন মাসখানেকের মধ্যেই।

এর আগে ১৯৯০-তে বাংলাদেশের 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় 'বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছে'— এইরকম একটি ভুল সংবাদ প্রকাশকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে প্রবল হিন্দু নির্যাতন শুরু হয়। ৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত মাত্র তিনদিনের জেহাদি আক্রমণে বহু হিন্দু হতাহত হন; ধর্ষিতা হন অজস্র হিন্দুমহিলা; মঠ মন্দির, ঘরবাড়ি, দোকানপাট ভাঙচুর ও লুঠপাট হয় অসংখ্য। এর পরে ১৯৯২ সালে শুরু হলো প্রবল হিন্দু বিরোধী সন্ত্রাস। ভয়াবহতায় এই সংগঠিত সন্ত্রাস বিশ্বের প্রথম দশটির মধ্যে স্থান পেতেই পারে। সিলেটে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষদের ভিটাবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। চারশো বছরের প্রাচীন একটি গ্রন্থাগার ছিল সেখানে। সেটিও ভস্মসাৎ করা হয়। ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরে অগ্নিসংযোগ হয়। পোড়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় ঐতিহাসিক ঢাকেশ্বরী মন্দির। চট্টগ্রামে সাতশো বাড়ি ভস্মীভূত। ভোলা জেলায় হিন্দু এলাকাগুলি ধ্বংসস্তূপ। দশ হাজারের বেশি পরিবার গৃহহীন হয়ে মাঘের শীতে খোলা আকাশের নীচে বসে থেকেছে। সারা দেশে বীভৎস বর্বরতা ও সহস্র নির্যাতিতের হাহাকার, ক্রন্দন। লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্বান্ত।

তসলিমা নাসরিন সেই সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক। প্রতিদিন হাসপাতালে আক্রান্ত হিন্দুরা আসতে থাকেন। তসলিমা তাদের চিকিৎসা করেন। দিনে দিনে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে এর ভয়াবহতা। চিকিৎসা করার পাশাপাশি তিনি আহত, ধর্ষিতা নর-নারীর সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতা সারেন। পুরোনো ঢাকার অলিগলি থেকে 'একতা', 'সংবাদ', 'আজকের কাগজ', 'ভোরের কাগজ' প্রভৃতি পত্রিকার পুরোনো সংখ্যা খুঁজে বের করেন। এই পত্রিকাগুলিতে এই ভয়াবহ দাঙ্গার বিবরণ প্রামাণ্য ভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। হিন্দুদের উপর প্রবল অত্যাচারের বিবরণ ছাপা হয়েছিল। তসলিমা এই বিবরণ ও নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখতে শুরু করেন উপন্যাস 'লজ্জা'। অপারেশন থিয়েটারে সার্জেন যখন রুগির অপারেশন করেন তখন তসলিমা নিজের পকেট থেকে কাগজ কলম বের করে সেই রুগির পাশে বসে লিখতে থাকেন 'লজ্জা'—সুরঞ্জন দত্তের ঘটনা। সুরঞ্জন দত্ত ঢাকার কোনো এক মহল্লায় থাকে। সে ধর্ম মানে না। সে নাস্তিক, সে কমিউনিস্ট। অথচ সেই সুরঞ্জনের জীবন ইসলামি জেহাদিদের আক্রমণে কীভাবে বদলে গেল সেই ঘটনাকে উপজীব্য করে 'খুব অল্প কথায়, অল্প বর্ণনায় মূলত তথ্য দিয়ে হিন্দুদের অবস্থার বর্ণনা করে লেখা। এটিকে না বলা যায় গল্প, না বলা যায় উপন্যাস।" (দ্বিখণ্ডিত)

১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার পার্ল পাবলিশার্স থেকে সেই বই প্রকাশ পেল। সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট নয়। উপন্যাস না বলে তথ্যমূলক প্রতিবেদন বললেই ভালো হয়। কেবল সুরঞ্জন, তার বোন মায়ার মতো কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্র, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির প্রভাবে সুরঞ্জনের মানসিক বিবর্তন ব্যতীত উপন্যাসের কোনো উপাদান এতে নেই বললেই চলে। নিজের আত্মজীবনী মূলক চতুর্থ উপন্যাস 'দ্বিখণ্ডিত'তে লেখিকা 'লজ্জা' উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "বইটির গদ্য ভালো নয়, বইটি উপন্যাস হয়নি, তথ্যে ঠাসা বইটি বার বারই মনোযোগ নষ্ট করে,... বইটিতে ত্রুটি আছে অবশ্যই। অল্প সময়ের মধ্যে লেখা। প্রকাশকের চাপে বইয়ের গুণগত মানগত ব্যাপারগুলো নিয়ে ভাবার জন্য মোটেও সময় পাইনি।" বইটি প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৯৩-এর বাংলাদেশের অমর একুশে বইমেলায় কয়েকদিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ সমাপ্ত হয় এবং দ্বিতীয় সংস্করণও প্রায় শেষের মুখে। এমতাবস্থায় বইমেলার মধ্যেই তসলিমা নাসরিনের উপর প্রাণঘাতী হামলা হয়। কোনোক্রমে কয়েকজন বন্ধু ও প্রকাশকের তৎপরতায় তাঁর প্রাণ রক্ষা হলেও বইমেলায় তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। এর কিছুদিন পরে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করছে' এই অপবাদে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১১ জুলাই ১৯৯৩ বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো। এর পরে তসলিমাকে বাংলাদেশ সরকার নির্বাসন দণ্ড

দেয়। তসলিমা বাংলাদেশ ছাড়েন।

এদিকে পশ্চিম বঙ্গেও তখন 'লজ্জা' প্রায় বেস্টসেলারের পর্যায়ে। আনন্দ পাবলিশার্সের সঙ্গে লেখিকার চুক্তি হয় এবং পুরোনো লেখাটির খোলনলচে পালটে নতুন রূপে নভেম্বর মাসে উপন্যাসটির প্রথম ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তার আগেই কলকাতা বইপাড়ার কয়েকজন প্রকাশক নিজেদের জীবন ও জীবিকার ঝুঁকি নিয়ে 'লজ্জা' ছাপিয়েছিলেন। সেই কথায় পরে আবার আসা যাবে।

এর পরে তসলিমার লেখা 'আমার মেয়েবেলা' (১৯৯৯), 'উতল হাওয়া' (২০০০), 'ক' (২০০৩) বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হয়। এরই মধ্যে ২০০৩ সালে তসলিমার আত্মজীবনী মূলক উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড 'দ্বিখণ্ডিত' প্রকাশিত হয় (প্রথম খণ্ড 'আমার মেয়েবেলা', দ্বিতীয় খণ্ড 'উতল হাওয়া', তৃতীয় খণ্ড 'ক')। পশ্চিমবঙ্গে তখন 'মার্ক্সবাদ সত্য, কারণ ইহা বিজ্ঞান' মার্কা প্রগতিশীল বাম সরকার ক্ষমতার মধ্য গগনে। সিপিএম-এর নেতাদের কথাই আইন। তাদের নির্দেশেই আকাশে সূর্য-চন্দ্র উদিত হয়, অস্তমিত হয়। সেই প্রগতিশীল, বাক্স্বাধীনতার ওকালতি করা, সর্বহারার কথা বলা, নারী স্বাধীনতার কথা বলা বাম সরকার 'দ্বিখণ্ডিত' উপন্যাসটি নিষিদ্ধ করল। যে দল 'ধর্ম'-কে আফিম বলে প্রচার করে সেই দলের সরকার 'ধর্মানুভূতি আহত হবে' এই কারণ দেখিয়ে একটি ফেমিনিস্ট বইকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল।

মজার ব্যাপার হলো, সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তখনও নন্দীগ্রামের সূর্যোদয় হয়নি। জনমানসে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একজন সেলিব্রিটি কবি এবং আপাদমস্তক সৎ ও ভদ্রলোক বলে পরিচিত। তিনি বললেন যে বইটি তিনি পড়েছেন এবং তার পরে কলকাতা খিলাফত কমিটির আবেদনে সাড়া দিয়ে বইটি নিষিদ্ধ করলেন। পিপলস্ বুক সোসাইটির অফিস ও গুদাম থেকে ২৫০০ কপি বই বাজেয়াপ্ত হলো। পাণ্ডুলিপির কপি বাজেয়াপ্ত হলো। প্রায় দুই বছর কলকাতা হাইকোর্টে মামলা চলল। এবং তারপর 'দ্বিখণ্ডিত' ছাড়পত্র পেল।

তসলিমাকে সাহিত্যিক ও কবির মর্যাদা জয় গোস্বামীরা দেননি। দিয়েছেন সেই মানুষগুলি যারা সেইদিন শান্তিপূর্ণ ভাবে কোনো ফতোয়া জারি না করে জয় গোস্বামীর চোখে চোখ রেখে তাকে 'চটিচাটা' বলে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে বাধ্য করেছে।

২০০৪ সাল থেকে তসলিমা কলকাতাতেই ছিলেন। ২০০৬ সালে কলকাতা টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম সৈয়দ মহম্মদ নুর উর রহমান বরকতি, যিনি নিজেকে কলকাতার শাহি ইমাম বলে দাবি করতেন, একটি ফতোয়া জারি করেন। সেখানে বলা হয়, যে ব্যক্তি তসলিমার মুখে কালি লেপতে পারবে বা তার চামড়া তুলে নিতে পারবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। বলাবাহুল্য, 'কবি বুদ্ধিজীবী সৎ ভদ্রলোক' বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল বাম সরকার এই ফতোয়ার ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করল না। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড ২০০৭-এর মার্চ মাসে তসলিমাকে হত্যা করার জন্য নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে ফতোয়া জারি করল। ৯ আগস্ট ২০০৭ হায়দরাবাদে একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে গেলে AIMIM-এর বিধায়কের প্ররোচনায় তসলিমার উপর প্রাণঘাতী হামলা হলো। ১৭ আগস্ট কলকাতার 'প্রগতিশীল' মুসলমানরা তসলিমাকে হত্যা করার জন্য বিপুল অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করল।

এই সমস্ত কিছুর মধ্যে একটি বাংলা পত্রিকায় 'দ্বিখণ্ডিত' উপন্যাসের কিছু উদ্ধৃতি ছাপা হলো। ২১ নভেম্বর ২০০৭ 'অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফোরাম' নামক জঙ্গিগোষ্ঠীর নেতৃত্বে কলকাতায় প্রতিবাদের নামে শুরু হলো সন্ত্রাস। সেই সন্ত্রাস মোকাবিলায় পার্ক সার্কাস ও মৌলালিতে সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করতে বাধ্য হলো সরকার। ভারত সরকার কলকাতা থেকে তসলিমাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন জয়পুর হয়ে দিল্লি। দীর্ঘ প্রায় চার মাস তাকে অজ্ঞাতবাসে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। ১৯ মার্চ ২০০৮ তিনি ভারত ছাড়তে বাধ্য হলেন। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গে তখনও প্রগতিশীল বাম সরকার এবং কেন্দ্রে তখন বামফ্রন্ট সমর্থিত ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্সের নেতৃত্বাধীন সরকার।

এরপর কালের চাকা ঘুরেছে। ২০১১-তে 'নন্দীগ্রামে সূর্যোদয়' সহ নানা ঘটনার অভিঘাতে পশ্চিমবঙ্গে বাম সরকারের সূর্য অস্তমিত হলো। নতুন ভোরের নতুন আশা নিয়ে ক্ষমতায় আসীন হলেন বঙ্গললনা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সহায় হলেন তথাকথিত 'সুশীল সমাজ'। সেই সুশীল সমাজ যারা তসলিমার বিরুদ্ধে ফতোয়ার প্রতিবাদ করার জন্য প্রয়োজনীয় সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি কোনদিন। সেই সুশীল সমাজের নেতৃত্বে ছিলেন অপর্ণা সেন, জয় গোস্বামী, ব্রাত্য বসু, শুভাপ্রসন্নরা।

তসলিমার মতো দীর্ঘদিনের বঞ্চিতরা এই পালাবদলে বোধহয় আশাবাদী হয়েছিলেন। এই বুঝি গণতন্ত্র, বাক্স্বাধীনতা, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। হাজার হোক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তো যথার্থ বামপন্থী। এতদিন যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা বাক্স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করেছিলেন তারাই মমতা ব্যানার্জির চারপাশে জড়ো হলেন।

২০১২-তে তসলিমার আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস সমূহের একটি 'নির্বাসন' প্রকাশের অনুষ্ঠানের বিরোধিতায় পথে নামল 'মিল্লি ইত্তেহাদ পরিষদ'। মমতা ব্যানার্জি ও ক্ষমতার বৃত্তে থাকা বুদ্ধিজীবীরা নীরব রইলেন।

তসলিমার উপন্যাস 'দুঃসহবাস'-কে উপজীব্য করে সুশান্ত বসুর পরিচালনায় মেগা সিরিয়ালের নির্মাণ শুরু হলো। অশোক সুরানার প্রয়োজনায় নির্মিত ধারাবাহিকের সম্প্রচার শুরু হওয়ার কথা ছিল আকাশ ৮

চ্যানেলে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে। চ্যানেলে ২১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে একটি ঘোষণায় জানানো হয় যে, ''একটি নির্দিষ্ট কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য দুঃসহবাসের সম্প্রচার বন্ধ রাখা হলো।'' নির্দিষ্ট কারণ'টি হলো 'মিল্লি ইত্তেহাদ পরিষদ'-এর হিংস্র প্রতিবাদ আন্দোলন ও তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের অলিখিত নির্দেশ। সারা শহর জুড়ে 'দুঃসহবাস'-এর প্রচারের হোর্ডিং খুলে ফেলা হলো রাতারাতি।

২০১৪-তে দিল্লির একটি বাঙ্গালি নাট্য সংস্থা নবপল্লী একটি নাটক প্রযোজনা করল। তসলিমার রচিত 'লজ্জা' অবলম্বনে নাটকটি রচনা করেন বিশ্বজিৎ সিনহা। দিল্লিতে তিনবার নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। ২০১৪-র ডিসেম্বরে পাণ্ডুয়ার ডায়মন্ড ক্লাবের নাট্য উৎসবে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার কথা ছিল। চার মাস আগে থেকে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, জেলাশাসক ও স্থানীয় প্রশাসনের চাপের মুখে পড়ে নাটকটির মঞ্চায়ন তারা বাতিল করেছেন।

জানুয়ারি ২০২৫। এই একই নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার কথা গোবরডাঙ্গায়। আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ঘটনাচক্রে পশ্চিমবঙ্গের থিয়েটার জগতের মুকুটহীন সম্রাট ব্রাত্য বসু তখন মন্ত্রী। শাঁওলী মিত্র, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তরাও ক্ষমতার বৃত্তে। ঘচনাচক্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য কবি জয় গোস্বামী তখন নজরুল অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান। সেই দিন নাট্যব্যক্তিত্ব শাঁওলি মিত্র, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, ব্রাত্য বসু, অপর্ণা সেন থেকে শুরু করে মহাবিপ্লবী সৌরভ পালোধির মতো ব্যক্তিত্বরা নাটকের স্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা নিয়ে মুখ খোলেননি।

ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেকটা জল বয়ে গিয়েছে। আবার একবার রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে। দীর্ঘ ১৯ বছরের নির্বাসন শেষে তসলিমা নাসরিন কলকাতায় এসেছেন ওসমান গনি, মোহিত রায়, শান্তনু সিনহাদের আমন্ত্রণে। আবেগের উচ্ছ্বাসে ভেসেছেন। এতদিনে হয়তো তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, 'হিন্দু কট্টরবাদ', 'গৈরিক সন্ত্রাসবাদ' প্রভৃতি ছেলেভোলানো রূপকথার কোনো সত্যতা নেই। লাল-পেড়ে সাদা শাড়ির প্রতীকে হয়তো সেই চিরন্তন হিন্দু সংস্কৃতিকেই বরণ করার মৌন বার্তা দিতে চেয়েছেন।

এই সমস্ত পুরোনো গল্প অনেকে জানেন। আবার যারা ১৯ বছর পরে তসলিমার কলকাতায় পদার্পণে উচ্ছ্বসিত হয়ে তসলিমা নাসরিনকে দেখতে গিয়েছেন তাদের অনেকে হয়তো-বা জানেনও না। কিন্তু, এই সমস্ত গল্পকথার নীচে চাপা পড়া একটা না বলা গল্প থেকে গিয়েছে। এই প্রতিবেদন সেই না বলা গল্প নিয়ে। এটি গল্পই। কারণ এই সত্যতা প্রমাণ করার কোনো দায় আমার নেই। এই গল্প বিশ্বাস করা বা না করা পাঠকের ইচ্ছাধীন।

'লজ্জা' যখন বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হয়েছে তখন কলকাতাতে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি না হলেও দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাম্যবাদী দলের নীরব চোখ রাঙানিতে 'লজ্জা'র বিক্রি বন্ধ ছিল। সেই সময়ে কলকাতা বইপাড়ার কয়েকজন দুঃসাহসী প্রকাশক 'লজ্জা' ছেপেছেন। সেই 'লজ্জা' ঢাকতে বইয়ের উপরে 'রামের সুমতি' কিংবা 'বিষবৃক্ষ'-এর মলাট চাপানো হয়েছিল। একই ঘটনা 'দ্বিখণ্ডিত' নিষিদ্ধ হওয়ার সময়েও হয়েছিল। সেই সময়ে, বিশেষ করে 'লজ্জা' প্রকরণে, আমি নেহাতই শৈশব পেরিয়ে কৈশোরের দিকে এগোচ্ছি। আমার মতো শৈশব থেকে কৈশোরে এগোনো বা কৈশোরে পড়া ছেলে অমুকদাদা কিংবা তমুককাকুর সঙ্গে বইপাড়া থেকে স্কুলের ব্যাগে করে নিষিদ্ধ বইয়ের ২০-২৫ টি কপি নিয়ে এসেছে। পরের দিন সেই কপি স্থানীয় মানুষদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন সেই সমস্ত দাদা বা কাকুরা। কাকু, দাদারা জানতেন যে রাস্তায় পুলিশ বাচ্চাদের স্কুলের ব্যাগ খানাতল্লাশি করে দেখবে না।

তসলিমার এই ঘটনা জানার কথা নয়। তসলিমা বাক্‌স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে কবি জয় গোস্বামীর বাক্‌স্বাধীনতা ও সম্মান অত্যন্ত মূল্যবান। যারা জয় গোস্বামীকে তাঁর সামনে অপমানিত করেছে তারা বাক্‌স্বাধীনতার বিরোধিতা করল।

একটু ভেবে দেখলে তসলিমা হয়তো উপলব্ধি করতে পারতেন যে, শৈশব থেকে কৈশোরে পা রাখা যে ছেলেটি নিজের পিঠে তার বইয়ের বোঝা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল কলকাতা থেকে মফস্‌সলে; সেই যে দুঃসাহসী বইপাড়ার প্রকাশক যারা 'লজ্জা' ঢেকেছিল 'বিষবৃক্ষ' বা 'রামের সুমতি'-তে; সেই দাদা বা কাকুরা যারা পাঠকের হাতে পৌঁছে দিয়েছিল নিষিদ্ধ সাহিত্যের সম্ভার, বাক্‌স্বাধীনতার লড়াইতে তারা তসলিমার হাতে হাত রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শামিল হয়েছিল। তারা কেউ জয় গোস্বামীর মতো নামকরা কবি নয়। তারা 'বেণীমাধব' বা 'সাঁঝবাতির রূপকথারা' লিখতে পারে না। তারা সরকারের সুনজরে থেকে নজরুল অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান হওয়ার কথা কোনোদিন ভাবেনি। তাদের কোরোনার চিকিৎসার ব্যয়ভার রাজ্য সরকার বহন করেনি। এবং তারা কোনদিন মুক্ত মঞ্চে দাঁড়িয়ে 'ক্যা ক্যা ছি ছি'-র মতো অমর মহাকাব্য রচনা করার কথাও ভাবেনি। কিন্তু তারা তসলিমার বাক্‌স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছে।

নীরবে অথচ সক্রিয় ভাবে দাঁড়িয়েছে। তসলিমাকে সাহিত্যিক ও কবির মর্যাদা জয় গোস্বামীরা দেননি। দিয়েছেন সেই মানুষগুলি যারা সেইদিন শান্তিপূর্ণ ভাবে কোনো ফতোয়া জারি না করে জয় গোস্বামীর চোখে চোখ রেখে তাকে 'চটিচাটা' বলে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে বাধ্য করেছে। এই সহজ ও স্বাভাবিক প্রতিবাদকে তসলিমা হয়তো প্রগতিশীলতার পরিপন্থী ভেবেছেন। তিনি এই প্রতিবাদকে ভিন্ন মতের কণ্ঠরোধ ভেবেছেন। কিন্তু তিনি ভেবে দেখেননি যে, যারা সেইদিন তসলিমার কবিতা শুনতে এসেছিলেন তারা তসলিমাকে ভিন্ন মতের জেনেও এসেছিলেন। তারা তসলিমার কণ্ঠরোধ করেননি, তাকে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। জয় গোস্বামীর কণ্ঠরোধ তার ভিন্ন মতের জন্য হয়নি। জয় গোস্বামীর কণ্ঠরোধ হয়েছে তার মেরুদণ্ডহীনতার জন্য।

তসলিমা জয় গোস্বামীর বাক্‌স্বাধীনতার কথা ভেবেছেন। তসলিমার কাছে আমার প্রশ্ন খুব সহজ। এই বিপুল সংখ্যক মানুষ যারা অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় প্রশ্ন তুলতে পেরেছেন 'রাজা তোর কাপড় কোথায়' তারা প্রগতিশীল; নাকি যিনি 'ক্যা ক্যা ছি ছি' গানে গলা মিলিয়েছিলেন তিনি প্রগতিশীল? □

নব্য-সাম্রাজ্যবাদ

‘রেজিম চেঞ্জ’-এর ছক ও ভারতের ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব

নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক চক্রান্তকে প্রতিহত করতে কেবল বিদেশি সোশ্যাল মিডিয়ার জবাবদিহি তলব করাই যথেষ্ট নয়; এর সঙ্গে যুক্ত অ্যালগরিদমিক পক্ষপাতিত্ব ও বিদেশি অর্থায়নের কালো হাতগুলোকেও চিহ্নিত করা বিশেষ জরুরি।

সাধন কুমার পাল

ইতিহাসের পাতায় সাম্রাজ্যবাদের রূপটি ছিল মূলত সরাসরি সামরিক অভিযান ও ভূখণ্ড দখলের। ব্রিটিশ, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ বা ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ— সব ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সামরিক শক্তির জোরে শাসন ব্যবস্থা কায়েম এবং সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যমে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ- উত্তর বিশ্বে আন্তর্জাতিক আইন ও নানা আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের ফলে সরাসরি সামরিক আগ্রাসনের পথ সংকুচিত হয়। বিশ্লেষকদের মতে, সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষার বিলোপ ঘটেনি; বরং তা গ্রহণ করেছে আরও সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ কৌশল, যা আধুনিক ভূ-রাজনীতিতে ‘নব্য-সাম্রাজ্যবাদ’ (Neo-Imperialism) বা ‘হাইব্রিড ওয়ারফেয়ার’ (Hybrid Warfare) নামে পরিচিত।

কৌশলের রূপান্তর— ‘রেজিম চেঞ্জ’ ও আধুনিক অপ্রতিসম যুদ্ধনীতি ঃ একুশ শতকে প্রত্যক্ষ ভূখণ্ড দখলের বদলে প্রাধান্য পাচ্ছে কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা অচল করা কিংবা ‘রেজিম চেঞ্জ’ বা সরকার পরিবর্তনের পরিবেশ তৈরি করা। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই কৌশলকে অনেক সময় ‘কালার রেভোলিউশন’ (Color revolution)-এর নতুন সংস্করণ বলা হয়।

এই প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদানগুলো হলো ঃ

(১) প্রজন্মভিত্তিক ক্ষোভ ও আবেগের ব্যবহার ঃ জেন-জি (Gen-Z) বা বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে নির্দিষ্ট কোনো সংবেদনশীল ইস্যুতে বিভিন্ন রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক সংগঠন, এনজিও ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সংগঠিত করে রাজপথে নামানো।

(২) তথ্যের কারচুপি ও টুলকিট রাজনীতি ঃ ডিজিটাল মাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে একপাক্ষিক ন্যারেটিভ ছড়িয়ে সাধারণ মানুষের অসন্তোষকে উসকে দেওয়া। তরুণ প্রজন্মের একাংশের বইপত্র পড়ার অভ্যাস না থাকার কারণে ফেসবুক, হোয়াটস্অ্যাপ, এক্স-হ্যান্ডল্, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব ইত্যাদি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত অজস্র লেখা, ছবি ও ভিডিয়োর দ্বারা তারা প্রতিনিয়ত প্রভাবিত হয়ে থাকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা অপপ্রচারের মাধ্যমে তাদের বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা করে থাকে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি নৈরাজ্যবাদী শক্তি। সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বারা জিও-পলিটিক্স বা ভূ-রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার একটি অন্যতম মাধ্যম হলো— ‘টুলকিট’-এর ব্যবহার। ‘টুলকিট’ হলো একটি ডিজিটাল ডকুমেন্ট বা রিসোর্স গাইড যা সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডাকে সংগঠিত, সমন্বিত ও প্রসারিত করতে ব্যবহৃত হয়। এটি অনলাইন যুগের একটি প্রচারপত্রের মতো কাজ করে, যা অরাজক শক্তির সমর্থকদের নির্দিষ্ট হ্যাশট্যাগের মাধ্যমে বিভিন্ন বার্তা দেওয়া-সহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে কোনো পোস্ট করা এবং সেই পোস্ট ভাইরাল করার প্রস্তাবিত তারিখ, বিভিন্ন দেশে বা রাজ্যে প্রতিবাদের নামে মিছিল ও জমায়েতের স্থান সংক্রান্ত খবরাখবর ও বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে সমন্বয়ের দ্বারা তাদের একটি অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৌশলী পদক্ষেপের দিকনির্দেশ সরবরাহ করে।

(৩) প্রশাসনিক পরিকাঠামো অচল করা ঃ দীর্ঘমেয়াদি পথ অবরোধ, রেল অবরোধ, বেআইনি জমায়েতের দ্বারা মূল প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলোকে অবরুদ্ধ করা এবং সাংবিধানিক কাঠামোর প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট করা।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপট— বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও নেপাল ঃ দক্ষিণ এশিয়া বর্তমানে বিভিন্ন বৃহৎ আন্তর্জাতিক শক্তির প্রতিযোগিতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক তোলপাড় ও গণবিক্ষোভ ও জেহাদি অভ্যুত্থানের বিশ্লেষণে দু’টি প্রধান কারণ পরিলক্ষিত হয়—

(১) অভ্যন্তরীণ উপাদান ঃ নীতিগত ভুল, অর্থনৈতিক সংকট এবং সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ।

(২) ভূ-রাজনৈতিক উপাদান ঃ বহু আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশ্লেষকের মতে, বিভিন্ন দেশের স্থানীয় পর্যায়ের এই ক্ষোভকে অনুঘটক (Catalyst) হিসেবে ব্যবহার করে গ্লোবাল ডিপস্টেট (Global Deep State) বা আন্তর্জাতিক গুপ্ত প্রশাসন ও তাদের অধীনস্থ এজেন্সিগুলি নিজেদের অনুগত বা সুবিধাজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করতে ভূমিকা রাখে। বিশ্বজোড়া লুঠতন্ত্রের প্রতিভূ ‘গ্লোবাল ডিপস্টেট’-এর অঙ্গুলিহেলনে চলতে কোনো দেশের সরকার অস্বীকৃত হলে সেই দেশে কালার রেভোলিউশন, সামরিক অভ্যুত্থান, জেহাদি অভ্যুত্থান ইত্যাদি

ফ ঃ ২

সংঘটিত করে সেই সরকারকে ফেলে দেওয়া এবং পুতুল সরকার তৈরির কাজ বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে করে থাকে গ্লোবাল ডিপস্টেট। তাদের আর্থিক মদতেই বিভিন্ন দেশে সংঘটিত হয়ে থাকে 'রেজিম চেঞ্জ অপারেশন'।

ভারতের অগ্রগতি ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপট ঃ বর্তমান বিশ্বে ভারত দ্রুততম বর্ধনশীল বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। বিশ্বের শীর্ষ উন্নত দেশগুলোর তালিকায় নিজের স্থান সুদৃঢ় করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে বর্তমান ভারত। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এবং সামরিক সক্ষমতার দিক থেকে ভারতের এই দ্রুত উত্থান অনেক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বীর (যেমন চীন, আমেরিকা ও অন্যান্য স্বার্থান্বেষী আন্তর্জাতিক শক্তি) চিন্তার কারণ। সরাসরি যুদ্ধ বা অর্থনৈতিক অবরোধের মাধ্যমে ভারতকে থামানো অসম্ভব হওয়ায়, ভারতের অভ্যন্তরে তৈরি হওয়া যেকোনো অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চলছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। **প্রকৃত ছাত্র আন্দোলন বনাম ছকবদ্ধ অস্থিতিশীলতা— এক বৈপরীত্যের চিত্র ঃ** ভারতে প্রকৃত গণদাবি এবং বিদেশি ও স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত কৃত্রিম আন্দোলনের পার্থক্য বোঝা অত্যন্ত জরুরি।

সম্প্রতি পঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক ও কেরলমে নিট (ইউজি)-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন বা প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছে, তার সঙ্গে দিল্লির যন্তর মন্তরের মতো আন্দোলনগুলোর চরিত্রগত এক বিশাল বৈপরীত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

(১) প্রকৃত আন্দোলনের চরিত্র (পঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক ও কেরলম) ঃ এসব রাজ্যে প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দাবিতে সরব। সেখানে কোনো দেশবিরোধী স্লোগান নেই, দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদাধিকারীকে অশোভন বা অশ্লীল গালিগালাজ করার উন্মাদনা নেই, মঞ্চে নাচ-গানের কোনো নাটকীয়তা নেই। এমনকী সেখানে কোনো বহিরাগত সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতার উপস্থিতি এবং দুবাই ও কাতার থেকে আসা বিলাসবহুল খাবারের সরবরাহ নেই। এগুলিই একটি প্রকৃত, স্বতঃস্ফূর্ত ও গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনের উদাহরণ।

(২) নয়াদিল্লিতে সংঘটিত আন্দোলনের ছক ও উদ্দেশ্য ঃ বিপরীতে, দেশের রাজধানী নয়াদিল্লিতে নিট (ইউজি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বহুল আলোচিত ইস্যুতে কিংবা 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র ব্যানারে যে দৃশ্যপট তৈরি করা হয়েছিল, তা সার্বজনীন ছাত্রস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল— ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে ছকবদ্ধ অবস্থান এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে উৎখাত করার মহড়ায় পরিণত হয়। কাতার ও দুবাই থেকে খাবারের নিয়মিত জোগান ছাড়াও মহম্মদ জুনেইদের পক্ষ থেকে প্রতিদিন সরবরাহ করা বিরাট অঙ্কের খাদ্যসামগ্রী, সোশ্যাল মিডিয়ায় কোটি কোটি টাকার প্রোপাগান্ডা কভারেজ, সুপ্রিম কোর্টে লিগ্যাল টিম দাঁড় করিয়ে নৈরাজ্যবাদীদের মুক্তির দাবিতে আইনি লড়াই এবং এই তথাকথিত আন্দোলনে ফারুক আবদুল্লা, মেহবুবা মুফতি, অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সহ কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি ও বামপন্থী নেতাদের সরাসরি সুযোগসন্ধানী অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, লালরঙা আরশোলাদের এই আন্দোলনগুলো ছাত্র কল্যাণের জন্য নয়; বরং ক্ষমতার লোভ ও দেশিয়-বিদেশি স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরিচালিত।

পূর্বের নজির : শাহিনবাগ থেকে কৃষক আন্দোলন— ২০১৪-র পর ভারতে এই ধরনের অপ্রতিসম অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা নতুন নয়। কিছু ঘটনার দিকে তাকালে এই কৌশল পরিষ্কার হয়—

(১) সিএএ-বিরোধী শাহিনবাগ আন্দোলন ঃ মাসের পর মাস রাজপথ অবরুদ্ধ রেখে দিল্লির স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত করা এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার প্রচেষ্টা।

(২) কৃষক আন্দোলন ও লালকেল্লার ঘটনা ঃ সাধারণ কৃষকদের দাবিকে ঢাল করে আন্তর্জাতিক মহল থেকে ব্যাপক ফান্ডিং ও টুলকিট তৈরির মাধ্যমে এক অরাজক গণ-আন্দোলন খাড়া করা এবং ২০২১-এর ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লির লালকেল্লায় ঢুকে জাতীয় পতাকাকে অবমাননা করে উগ্রপন্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো।

(৩) সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনসমূহ ঃ ছাত্র বা তরুণ সমাজের ক্ষোভকে সরাসরি নেপাল বা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অরাজক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মতো মোড় দেওয়ার অপচেষ্টা।

(৪) ডিজিটাল ও আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ ঃ দেশি-বিদেশি এনজিও, সোশ্যাল মিডিয়া ও এফসিআরএ-র ভূমিকা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এফসিআরএ আইনের ফাঁকফোকর কাজে লাগিয়ে এদেশের অসংখ্য এনজিও-র মাধ্যমে অর্থের প্রবাহ অব্যাহত রাখে বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা। বিনিময়ে তাদের স্বার্থে ভারতের মধ্যে পরিচালিত হয় মাদক ব্যবসা-সহ বিভিন্ন পাচার চক্র, ধর্মান্তরণ চক্র, জেহাদি, মাওবাদী ও বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাস। এই পাপচক্রকে ধ্বংসের লক্ষ্যে বিদেশি অর্থের অনৈতিক প্রবাহে বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতীয় সংসদের বাদল অধিবেশনে (২০ জুলাই-১৩ আগস্ট) এফসিআরএ বিল-সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ হওয়া আটকাতে নয়াদিল্লি উত্তাল হয়ে ওঠে নৈরাজ্যবাদী ককরোচ আন্দোলনে। সচেতন নাগরিকদের চোখে দেশকে অশান্ত করার লক্ষ্যে ককরোচদের এই সক্রিয়তা ধরা পড়ে গিয়েছে। তাই আরশোলাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই স্লোগান উঠেছে— 'নিট কা বাহানা? এফসিআরএ পর নিশানা!'

নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক চক্রান্তকে প্রতিহত করতে কেবল বিদেশি সোশ্যাল মিডিয়ার জবাবদিহি তলব করাই যথেষ্ট নয়; এর সঙ্গে যুক্ত অ্যালগরিদমিক পক্ষপাতিত্ব ও বিদেশি অর্থায়নের কালো হাতগুলোকেও চিহ্নিত করা বিশেষ জরুরি।

(১) অ্যালগোরিদমের সূক্ষ্ম চাল এবং ডিজিটাল গৃহযুদ্ধের ষড়যন্ত্র ঃ সিজেপি-র আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিদেশি সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানি 'মেটা'র এক অদ্ভুত আচরণ সম্প্রতি সকলের চোখে পড়ে। এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে করা বিভিন্ন পোস্টে চরম ভারত-বিরোধী কন্টেন্ট শেয়ার করা হলেও সেই পোস্টগুলিকে ব্লক বা সেন্সর কোনোটাই করেনি 'মেটা'। কিন্তু এই আন্দোলন সম্পর্কে সমালোচনামূলক বক্তব্য-আধারিত বিভিন্ন পোস্ট আগাগোড়া সেন্সর করেছে 'মেটা'। প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা বলেছে যে, এই পোস্টগুলি তাদের 'কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড'-এর সঙ্গে মানানসই নয়। প্রশ্ন ফাঁস রুখতে কড়া

আইন প্রণয়ন ও অপরাধীদের দ্রুত শাস্তিদানের লক্ষ্যে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠনের বার্তা দিয়ে গত ২৮ জুলাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজী দেশের যুবসমাজের উদ্দেশে ফেসবুকে একটি সেলফি-স্টাইল ভিডিয়ো পোস্ট করার পর রাত সাড়ে বারোটা থেকে ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত পোস্টটিকে 'রেস্ট্রিক্ট' করে 'মেটা'। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ফেসবুক পোস্ট 'রেস্ট্রিক্ট' করার বিষয়ে 'মেটা'র গ্লোবাল এক্সিকিউটিভদের জবাবদিহি তলব করে ভারত সরকারের ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রক। গত ৫ আগস্ট 'মেটা'র চিফ গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স অফিসার জোয়েল কাপলান নয়াদিল্লিতে রেলভবনে কেন্দ্রীয় তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রকের সচিব এস. কৃষ্ণনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীর পোস্ট করা ভিডিয়োটি অনিচ্ছাকৃত ও প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে কিছু সময়ের জন্য সরিয়ে ফেলা হয়েছিল বলে মন্ত্রীকে জানান। উল্লেখ্য, বিদেশি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে (মেটা, ইনস্টাগ্রাম বা এক্স) অ্যালগোরিদম্ এমন এক বিপজ্জনক কৌশলে সেট করা হয়েছে যা কোনো দেশে সহজেই অভ্যন্তরীণ সংঘাত বা গৃহযুদ্ধ উসকে দিতে পারে।

(২) বিপরীতমুখী কন্টেন্ট পুশ ঃ জাতীয়তাবাদী বা দেশপ্রেমী কন্টেন্টগুলোকে সচেতনভাবেই পাঠানো হয় দেশবিরোধী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার ব্যবহারকারীদের স্ক্রিনে। তারা সেখানে এসে একের পর এক উসকানিমূলক মন্তব্যের দ্বারা এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে যেন মনে হবে জাতীয়তাবাদীরাই দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে।

(৩) 'প্রশিক্ষিত বনাম অপ্রশিক্ষিত' প্রতিরোধ ঃ এর বিপরীতে, দেশবিরোধী বা তথাকথিত 'টুকরে টুকরে গ্যাং'-এর ভিডিয়োগুলোকে বেছে বেছে পাঠানো হয় সাধারণ মানুষ তথা জাতীয়তাবাদী মানসিকতাসম্পন্ন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের কাছে। দেশপ্রেমী সাধারণ ইউজাররা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত বা ডিজিটাল প্রোপাগান্ডায় অতটা প্রশিক্ষিত না হওয়ায়, তারা এই চরমপন্থী কন্টেন্টগুলো দেখে যথারীতি উত্তেজিত ও প্রভাবিত হন। অনেক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী মানসিকতার ব্যক্তিদের ফেসবুক প্রোফাইল ও ফেসবুক পোস্টের 'রিচ' কমিয়ে দেয় 'মেটা'। এর বিপ্রতীপে তাদের সেই 'অদ্ভুত' অ্যালগোরিদ্‌মের কারসাজিতে ভাইরাল হতে থাকে দেশবিরোধীদের বিভিন্ন পোস্ট। এই পোস্টগুলির বিরুদ্ধে অসংখ্য 'রিপোর্ট' হলেও সেগুলিকে রিমুভ করার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় থাকে 'মেটা'। জাতীয়তাবাদীদের বিভিন্ন পোস্টে কেউ কোনো 'রিপোর্ট' না করলেও ওই অ্যালগোরিদ্‌মের ভেল্কিতে তা অটো-সেন্সরশিপের সম্মুখীন হয়।

(৪) দ্বিমুখী মানদণ্ড (Double Standard) ঃ একই অ্যালগোরিদ্‌মিক নিয়মে সাধারণ কোনো জাতীয়তাবাদী কন্টেন্ট সহজে 'রিচ' পায় না বা ভাইরাল হয় না। এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য সংবলিত ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে সেন্সর্ড হলেও, মোদীজীকে উদ্দেশ্য করে চরম গালাগালি বা উসকানিমূলক পোস্টগুলোর বিরুদ্ধে 'মেটা'র পক্ষ থেকে কমিউনিটি গাইডলাইন লঙ্ঘনের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

(৫) প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্বের তাগিদ ঃ এই ধরনের ডিজিটাল পক্ষপাতিত্ব প্রমাণ করে যে বহুজাতিক টেক-জায়ান্টরা ভারতের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করতে ব্যাকস্টেজ প্লেয়ার হিসেবে কাজ করছে। কালচারাল মার্ক্সিস্টরা দখল করে রয়েছে কর্পোরেট দুনিয়ার শীর্ষমহল। সুন্দর পিচাইয়ের মতো বিশ্বমানের মেধা ভারতের রয়েছে; তাই চীন বা অন্যান্য স্বাবলম্বী দেশের মতো ভারতেরও নিজস্ব দেশীয় ডিজিটাল ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি।

(৬) এনজিও-র ছদ্মবেশে বিদেশি ফান্ডিং ও এফসিআরএ আইন ঃ বিভিন্ন ভারত-বিরোধী চক্রান্ত বাস্তবায়নের পেছনে বড়ো ভূমিকা নেয় কিছু আন্তর্জাতিক এনজিও, যারা মানবাধিকারের বাহানায় বিদেশ থেকে কোটি কোটি ডলার ভারতে পাঠায়। এবারের বর্ষাকালীন অধিবেশনে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এফসিআরএ বা 'দ্য ফরেন কন্ট্রিবিউশন (রেগুলেশন) অ্যাক্ট' আইনে সংশোধনীর দ্বারা আইনটির কঠোর প্রয়োগ ও স্বচ্ছ অডিট বাধ্যতামূলক করার ফলে বিদেশি মদতপুষ্ট, অস্থিতিশীলতাসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলোর ওপর বড়ো আঘাত নেমে আসতে চলেছে।

(৭) আশু বিপদ থেকে বাঁচার উপায় এবং ভারতের অটুট সুরক্ষাকবচ ঃ বাংলাদেশ, নেপাল বা অন্য কোনো দেশের সঙ্গে ভারতের মূল পার্থক্য হলো ভারতের বহু সহস্রাব্দ-প্রাচীন দৃঢ় সাংস্কৃতিক ভিত্তি, অভূতপূর্ব জাতীয় ঐক্য, সামাজিক সম্প্রীতি এবং দেশপ্রেমের গভীর অনুভূতি।

(৮) ইতিহাসের পাতায় প্রমাণিত জাতীয় ঐক্য ঃ ভারতের মানুষ রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপোশহীন। ১৯৬২-র চীন যুদ্ধ, ১৯৭১-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ কিংবা ১৯৯৯-এর কার্গিল যুদ্ধের তীব্র সংকটকালে গোটা দেশ যেভাবে একসূত্রে গেঁথে গিয়েছিল, তা বিশ্ব দেখেছে। এমনকী সাম্প্রতিক করোনা অতিমারীর সময়েও ১৪০ কোটি ভারতবাসী সব পার্থক্য ভুলে এক হয়ে সেই বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।

(৯) 'ভারতমাতা'— আবেগের প্রতিমূর্তি ও পরম রক্ষাকবচ : অন্য অনেক দেশের কাছে ভূখণ্ড কেবলই একটি ভৌগোলিক মানচিত্র, কিন্তু ভারতের মানুষের কাছে এই দেশ হলো 'মা'। ভারতমাতার প্রতি নাগরিকদের এই শ্রদ্ধা, জননী-জন্মভূমির প্রতি এই দেশের সন্তানদের আবেগ, আত্মত্যাগ ও সমর্পণের মনোভাবই যেকোনো দেশবিরোধী আন্দোলন বা চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেওয়ার সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রক্ষাকবচ। একুশ শতকের সাম্রাজ্যবাদ আর সৈন্য পাঠিয়ে দেশ দখল করে না; তা ফিরে আসে অর্থনৈতিক ও তথ্য-প্রযুক্তিগত সাম্রাজ্যবাদের রূপ পরিগ্রহ করে; অ্যালগোরিদ্‌মিক কারচুপি, ডিজিটাল প্রোপাগান্ডা, এনজিও-র ছদ্মবেশে ছায়াফান্ডিং ও প্রক্সি আন্দোলনের রূপ ধরে। তবে আইনি ও প্রশাসনিক স্তরে এফসিআরএ (সংশোধনী) বিলের মতো শক্ত পদক্ষেপ, স্বদেশি প্রযুক্তির প্রসার এবং সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধির সামনে কোনো বিদেশি চক্রান্তই স্থায়ী হতে পারবে না। দেশবাসী যখন পঞ্জাব, কর্ণাটক, ঝাড়খণ্ড বা কেরলমের মতো প্রকৃত ও শৃঙ্খলিত আন্দোলনের সঙ্গে নয়াদিল্লির মতো কৃত্রিম রাজনৈতিক সার্কাস এবং সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বারা তৈরি ট্র্যাপের ফারাক বুঝতে শিখবে, তখনই সমস্ত ভূ-রাজনৈতিক চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে ভারতের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব আরও সুদৃঢ় হবে। □

‘বন্দে মাতরম্’-এর আইনি মর্যাদা ও জাতীয় সম্মান রক্ষার নতুন অধ্যায়

ধর্মানন্দ দেব

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এমন কিছু শব্দ, প্রতীক, ও সঙ্গীত রয়েছে, যেগুলি কেবল সাহিত্য বা সংস্কৃতির সম্পদ নয়, বরং একটি জাতির আত্মপরিচয়, আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ‘বন্দে মাতরম্’ সেই ধরনেরই এক অমর সৃষ্টি, যা দেড় শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

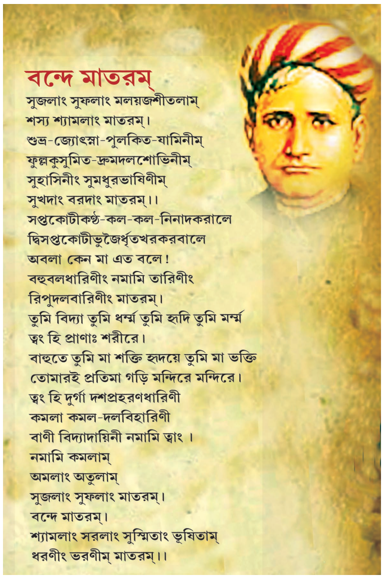

এই গান কেবল একটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত নয়; এটি ছিল পরাধীন ভারতের কোটি কোটি মানুষের স্বাধীনতার মন্ত্র, বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা এবং জাতীয় চেতনার জাগরণের এক অমোঘ আহ্বান। স্বাধীনতা সংগ্রামে অসংখ্য বিপ্লবী যখন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তখন তাঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে ‘বন্দে মাতরম্’। ফাঁসির মঞ্চে, কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে, আন্দোলনের জনসভায় ও প্রতিবাদী পদযাত্রায় এই ধ্বনি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর আত্মমর্যাদার প্রতীক। সেই কারণেই স্বাধীনতার পর ভারতীয় গণপরিষদ এই গানকে ‘জাতীয় স্তোত্র’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং জাতীয় সঙ্গীত ‘জনগণমন অধিনায়ক’-এর সমমর্যাদায় সম্মান প্রদানের ঘোষণা করে। কিন্তু দীর্ঘ সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে এই সম্মান আইনগত সুরক্ষার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেনি। অবশেষে ২০২৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ‘The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026’ সংসদে উত্থাপন করে সেই দীর্ঘদিনের আইনি শূন্যতা পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলে প্রথমবারের মতো জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম্’কে জাতীয় সঙ্গীতের মতোই আইনগত সুরক্ষার আওতায় আনার পথে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৮৭৫ সালে সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘বন্দে মাতরম্’ রচনা করেন। পরবর্তীকালে ১৮৮২ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’-এ গানটি অন্তর্ভুক্ত হয়। মাতৃভূমিকে দেবীমূর্তিরূপে কল্পনা করে রচিত এই গান ভারতীয় সাহিত্যজগতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। কিন্তু এর গুরুত্ব কেবল সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। অল্প সময়ের মধ্যেই এটি ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অনুপ্রেরণায় পরিণত হয়। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমবার ‘বন্দে মাতরম্’ গানটি সুরারোপ করে পরিবেশন করেন। এরপর থেকে কংগ্রেসের অধিবেশন, জাতীয়স্তরে সভা-সমিতি এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে এই গান অপরিহার্য হয়ে ওঠে। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ, লালা লাজপত রাই-সহ অসংখ্য জাতীয় নেতা ‘বন্দে মাতরম্’কে জাতীয় জাগরণের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ-ভারত সরকার বহু সময় এই ধ্বনিকে বিদ্রোহের প্রতীক মনে করে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করে। বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি কার্যালয় এবং জনসভায় ‘বন্দে মাতরম্’ উচ্চারণের কারণে ছাত্র, শিক্ষক ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু সরকারি দমননীতি এই গানকে স্তব্ধ করতে পারেনি; বরং এটি আরও শক্তিশালীভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের প্রতীক হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে ‘বন্দে মাতরম্’ কেবল একটি গান ছিল না; এটি ছিল আত্মত্যাগের শপথ। অসংখ্য বিপ্লবী মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগে শেষবারের মতো ‘বন্দে মাতরম্’ উচ্চারণ করেছেন। আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এই গান গেয়ে নিজেদের মনোবল দৃঢ় রাখতেন। অসহযোগ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন এবং পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে ‘বন্দে মাতরম্’ ভারতীয় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। সেই ঐতিহাসিক ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবেই স্বাধীন ভারতের

জাতীয় নেতৃত্ব এই গানকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেন।

১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি ভারতের গণপরিষদের শেষ অধিবেশনে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গণপরিষদের সভাপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘোষণা করেন যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'জনগণমন অধিনায়ক' ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হবে এবং ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দে মাতরম্' স্বাধীনতা সংগ্রামে এর অনন্য অবদানের কারণে সমান মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী জাতীয় স্তোত্র হিসেবে স্বীকৃত থাকবে। এই ঘোষণার মাধ্যমে গণপরিষদ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, জাতীয় জীবনে 'বন্দে মাতরম্'-এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কোনোভাবেই কম নয়। যদিও সংবিধানে 'জাতীয় স্তোত্র' শব্দবন্ধ আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবুও গণপরিষদের এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সাংবিধানিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় স্তোত্র— উভয়ই জাতীয় মর্যাদার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

কিন্তু ১৯৭১ সালে 'The Prevention of Insults to National Honour Act' প্রণীত হলে সেখানে ভারতের জাতীয় পতাকা, ভারতের সংবিধান ও জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননাকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম্'কে সেই আইনের আওতায় আনা হয়নি। ফলে গণপরিষদের ঘোষিত সমমর্যাদা বাস্তব আইনি সুরক্ষায় প্রতিফলিত হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়ায় বাধা দিতেন অথবা অনুষ্ঠান চলাকালে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতেন, তাহলে এই বিশেষ আইনের অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ ছিল না। বিষয়টি বহু বছর ধরে বিভিন্ন মহলে আলোচনার বিষয় ছিল।

এই প্রেক্ষাপটে ২০২৬ সাল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই বছর 'বন্দে মাতরম্' রচনার সার্ধশতবর্ষপূর্তি পালিত হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক বছরেই কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে 'The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026' উত্থাপন করে। গত ২৪ জুলাই রাজ্যসভায় বিলটি উপস্থাপিত হয়। বিলটির মূল উদ্দেশ্য হলো, জাতীয় সঙ্গীতের মতোই জাতীয় স্তোত্র 'বন্দে মাতরম্'কেও একই ধরনের আইনগত সুরক্ষা প্রদান করা এবং গণপরিষদের ঘোষিত সমমর্যাদাকে কার্যকর আইনি ভিত্তি প্রদান করা।

১৯৭১ সালের 'The Prevention of Insults to National Honour Act' প্রণীত হওয়ার সময় আইনটির মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের জাতীয় পতাকা, সংবিধান ও জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা রক্ষা করা। এই আইনের ৩ নম্বর ধারায় জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন'-এর গাওয়া ইচ্ছাকৃতভাবে বাধাগ্রস্ত করা অথবা জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অপরাধ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়— ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি গণপরিষদে 'বন্দে মাতরম্'কে জাতীয় সঙ্গীতের সমমর্যাদার সম্মান প্রদান করলেও ১৯৭১ সালের আইনে জাতীয় স্তোত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে স্বাধীনতার ইতিহাসে অপরিসীম গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও 'বন্দে মাতরম্' দীর্ঘদিন আইনগত সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সময়ে আইনজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং সংসদের সদস্যদের একাংশ জাতীয় গানকেও একই আইনি সুরক্ষার আওতায় আনার দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

এই দীর্ঘদিনের অসঙ্গতি দূর করার লক্ষ্যেই বর্তমান কেন্দ্র সরকার 'The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026' সংসদে উত্থাপন করেছে। বিলটির মূল দর্শন হলো নতুন কোনো সাংবিধানিক মর্যাদা সৃষ্টি করা নয়; বরং গণপরিষদের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে কার্যকর আইনগত ভিত্তি প্রদান করা। প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুসারে, জাতীয় স্তোত্র 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া ইচ্ছাকৃতভাবে বাধাগ্রস্ত করা, গান পরিবেশনরত সভা বা অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, অথবা জাতীয় স্তোত্রের প্রতি প্রকাশ্য অসম্মান প্রদর্শন করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে একই আইনের অধীনে ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। অপরাধ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান থাকবে। একই ব্যক্তি পুনরায় একই ধরনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে আরও কঠোর শাস্তির প্রস্তাবও বিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, জাতীয় প্রতীকগুলির প্রতি অসম্মান কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্'-এর মর্যাদা রক্ষায় দেশ সর্বদা আপোশহীন থাকবে।

বিলের Statement of Objects and Reasons-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২৪ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে ভারতীয় গণপরিষদ জাতীয় স্তোত্রকে জাতীয় সঙ্গীতের সমমর্যাদা প্রদান করলেও বিদ্যমান আইন সেই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করেনি। ফলে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়ার সময় ইচ্ছাকৃত বাধা সৃষ্টি বা বিশৃঙ্খলা ঘটানোর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ সীমিত ছিল। এই অসামঞ্জস্য দূর করাই সংশোধনী বিলের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সরকার এই বিলের মাধ্যমে কোনো নতুন জাতীয় স্তোত্র সৃষ্টি করছে না; বরং দীর্ঘদিনের একটি আইনগত ঘাটতি পূরণ করছে।

এই উদ্যোগের আরেকটি বিশেষ তাৎপর্য হলো, ২০২৬ সালে 'বন্দে মাতরম্' রচনার ১৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। দেড়শো বছর আগে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে গান রচনা করেছিলেন, সেটি আজও ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস, জাতীয় ঐক্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের অন্যতম শক্তিশালী প্রতীক। এই ঐতিহাসিক বছরেই জাতীয় গানকে আইনগত সুরক্ষার আওতায় আনার উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি প্রতীকী ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সরকারি অনুষ্ঠানসমূহে জাতীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি জাতীয় স্তোত্র পরিবেশনের বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করেছিল। সেই প্রশাসনিক উদ্যোগের পর আইন সংশোধনের প্রস্তাব সরকার যে একটি ধারাবাহিক নীতি অনুসরণ করছে, তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

তবে সংসদে এই বিল নিয়ে ভিন্নমতও প্রকাশিত হয়েছে। বিরোধী দলের কিছু সদস্যের বক্তব্য ছিল, গণপরিষদ সচেতনভাবেই জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় স্তোত্রকে পৃথক সাংবিধানিক অবস্থানে রেখেছিল এবং বিষয়টি আরও বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। অন্যদিকে সরকারের বক্তব্য, এই সংশোধনী গণপরিষদের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী নয়; বরং সেই সিদ্ধান্তকে বাস্তব আইনগত রূপ দেওয়ার একটি স্বাভাবিক ও যৌক্তিক পদক্ষেপ। গণতান্ত্রিক সমাজে মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক প্রতীক এবং জাতীয় মর্যাদার বিষয়গুলিতে সুস্থ বিতর্কের মাধ্যমে ঐকমত্য গড়ে তোলাই গণতন্ত্রের শক্তি।

ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫১এ (ক) অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের অন্যতম মৌলিক কর্তব্য হলো সংবিধান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। যদিও এই অনুচ্ছেদে জাতীয় স্তোত্রের নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তথাপি গণপরিষদের ঘোষণার আলোকে 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় মর্যাদার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় স্তোত্রের মর্যাদা রক্ষার জন্য পৃথক আইনগত সুরক্ষা প্রদান সংবিধানের মৌলিক চেতনার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে অনেক সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছেন।

এদিকে, সংসদে জাতীয় গানকে আইনগত সুরক্ষা দেওয়ার উদ্যোগ যখন দেশজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে, ঠিক সেই সময়ে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস্ ব্যুরো (এনসিআরবি)-র প্রকাশিত পরিসংখ্যান একটি ভিন্ন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আইন যত কঠোরই হোক না কেন, তার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত না হলে সেই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ হয় না— এই মৌলিক সত্যই পরিসংখ্যানের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত 'The Prevention of Insults to National Honour Act,1971'-এর অধীনে সারা দেশে মোট ৬৯৯টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে এবং ১,১০২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে আদালতে মাত্র ৬০ জন দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। অর্থাৎ গ্রেপ্তার ও মামলা দায়েরের তুলনায় দণ্ডাদেশের হার অত্যন্ত কম। এটি শুধু বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার প্রশ্নই তোলে না, বরং তদন্ত, চার্জশিট দাখিল এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের সামগ্রিক দক্ষতা নিয়েও প্রশ্নের জন্ম দেয়।

২০২৪ সালের পরিসংখ্যান আরও উদ্বেগজনক। ওই বছরে এই আইনের অধীনে বিচার শেষ হওয়া মামলাগুলির মধ্যে মাত্র ৬ জনের বিরুদ্ধে দোষ প্রমাণিত হয়েছে, অথচ ২৪ জন মুক্তি পেয়েছেন। একই সঙ্গে তদন্ত সম্পন্ন করে চার্জশিট দাখিলের হার প্রায় ৩৬.৫ শতাংশে নেমে এসেছে, যা ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার জন্য সন্তোষজনক তথ্য নয়। চার্জশিট দাখিলে বিলম্ব বা অপর্যাপ্ত তদন্তের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই আদালতে অভিযোগ প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। ফলস্বরূপ অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তি পান এবং আইনের প্রতিরোধমূলক উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যাহত হয়। কঠোর আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও যদি তদন্ত দুর্বল হয়, তবে আইন বাস্তবে কাঙ্ক্ষিত ফল দিতে পারে না।

পরিসংখ্যান আরও দেখায় যে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলেছে। ২০১৪ সালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৮৫টি, যা ২০২৪ সালে বেড়ে ৩৫৮টিতে পৌঁছেছে। অর্থাৎ এক দশকে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা চার গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি বিচারব্যবস্থার ওপর ক্রমবর্ধমান চাপের ইঙ্গিত বহন করে। আবার ২০২০ সালে সর্বাধিক ৪০৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও ওই বছর একজনও দোষী সাব্যস্ত হননি। এই তথ্য স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে শুধুমাত্র গ্রেপ্তার বা মামলা রুজু করাই যথেষ্ট নয়; দ্রুত, নিরপেক্ষ এবং বৈজ্ঞানিক তদন্তের মাধ্যমে আদালতে অপরাধ প্রমাণ করাই আইনের প্রকৃত সাফল্যের মাপকাঠি।

এই প্রেক্ষাপটে ২০২৬ সালের সংশোধনী বিলের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম্'কে আইনগত সুরক্ষার আওতায় আনা নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হলেও, সেই আইন বাস্তবে কতটা কার্যকর হবে, তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে তার যথাযথ প্রয়োগের ওপর। যদি তদন্ত দীর্ঘসূত্রিতার শিকার হয়, চার্জশিট দাখিলে অযথা বিলম্ব ঘটে, সাক্ষ্যগ্রহণ বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে অথবা অপরাধ প্রমাণে প্রশাসনিক ব্যর্থতা দেখা দেয়, তাহলে নতুন আইনও প্রত্যাশিত ফল দিতে পারবে না। অতীতের অভিজ্ঞতা তাই সরকার, তদন্তকারী সংস্থা এবং বিচারব্যবস্থার সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরে— শুধু কঠোর আইন নয়, তার কার্যকর বাস্তবায়নই প্রকৃত সাফল্যের চাবিকাঠি।

জাতীয় প্রতীকের প্রতি সম্মান কেবল আইন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায় না; এটি মূলত নাগরিকের চেতনা, শিক্ষা, সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সমাজজীবনের প্রতিটি স্তরে জাতীয় প্রতীকগুলির ইতিহাস, তাৎপর্য ও মর্যাদা সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে যে 'বন্দে মাতরম্' কেবল একটি গান নয়— এটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল, স্বাধীনতা যুদ্ধে অসংখ্য বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবীর আত্মত্যাগের স্মারক এবং ভারতের জাতীয় চেতনার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। আইন নাগরিককে শাস্তির ভয় দেখাতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সম্মান জন্ম নেয় জ্ঞান, উপলব্ধি ও দেশপ্রেম থেকে।

ভারতের সংবিধান নাগরিকদের শুধু অধিকারই দেয়নি, পাশাপাশি মৌলিক কর্তব্যও নির্ধারণ করেছে। জাতীয় প্রতীকগুলির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন সেই সাংবিধানিক কর্তব্যেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রতি আইনগত সুরক্ষা প্রদান তাই কোনো ব্যক্তি বা রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রশ্ন নয়; এটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, জাতীয় ঐক্য এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি সমগ্র জাতির শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ। একই সঙ্গে এটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যাঁরা আত্মবলিদান দিয়েছেন, তাঁদের আদর্শ ও ত্যাগকে সম্মান জানানো প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব।

দেড় শতাব্দী আগে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে অমর সৃষ্টি ভারতবাসীকে উপহার দিয়েছিলেন, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সময় বদলেছে, দেশের কাঠামো বদলেছে, প্রযুক্তি ও সমাজব্যবস্থা বদলেছে; কিন্তু মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা, জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার মূল্যবোধ কখনও পরিবর্তিত হয় না।

২০২৬ সালের সংশোধনী বিল সেই চিরন্তন মূল্যবোধকেই নতুন আইনগত ভিত্তি দেওয়ার একটি ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা। তবে এই উদ্যোগের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে কেবল আইন পাশ হওয়ার ওপর নয়, বরং তার কার্যকর বাস্তবায়ন, দ্রুত তদন্ত, সময়োপযোগী বিচার, দোষীদের নিশ্চিত শাস্তি এবং সর্বোপরি নাগরিক সমাজের মধ্যে জাতীয় প্রতীকগুলির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলার ওপর। আইন, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা এবং সচেতন নাগরিক সমাজ— এই চারটি স্তম্ভ সমানভাবে শক্তিশালী হলেই 'বন্দে মাতরম্'-এর মর্যাদা কেবল আইনের বইয়ে নয়, জাতির হৃদয়েও আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক আদর্শ আরও সমৃদ্ধ, সুসংহত ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জাতীয় অখণ্ডতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ

ডঃ বলরাম দে

ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জাতীয় অখণ্ডতার বিরুদ্ধে বিদেশি ষড়যন্ত্রের ইতিহাস এবং তার কদর্য রূপ সম্পর্কে দেশবাসী কম-বেশি সকলেই অবগত। সেই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব যুগোপযোগী ও সময়োচিত সমাধানের সন্ধানে বারবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। স্বাধীনতার পূর্বে ও পরবর্তীকালেও বহু মহাপুরুষ জাতির ঐক্য, অখণ্ডতা ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন এবং বহুলাংশে সফল হয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের মাটিতে সেই অপচেষ্টার ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত রয়েছে।

অতি সম্প্রতি নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসকে কেন্দ্র করে সেই দীর্ঘকালীন রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলি আবারও সক্রিয় হয়ে উঠে জাতীয়তাবাদী শক্তির সামনে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে।

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্র ও রাজ্যের যুগ্ম তালিকার অন্তর্গত। সময়ে সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে, এমনকী কেন্দ্রীয় পরীক্ষাতেও প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। প্রশ্নফাঁস রোধে সংসদে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হলেও কোথাও না কোথাও তা অপর্যাপ্ত থেকে গিয়েছে অথবা প্রশাসনিক ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবকদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ ও হতাশা তৈরি হয়েছে। বহু শিক্ষার্থী প্রত্যাশিত ফল অর্জন করতে না পেরে চরম মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে, এমনকী কেউ কেউ আত্মহননের পথও বেছে নিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই, পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত করার দাবিতে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও সচেতন নাগরিক সমাজের আন্দোলন একটি ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকার। নয়াদিল্লির যন্তরমন্তরে ছাত্রদের বিভিন্ন দাবির সমর্থনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান ও প্রতিবাদ তারই প্রতিফলন ছিল। নিট প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে গত ৬ জুন থেকে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি-র) পক্ষ থেকে শুরু হওয়া ধরনা ও বিক্ষোভ প্রাথমিকভাবে শান্তিপূর্ণই ছিল। অভিজিৎ দিপকে, সৌরভ দাস হলেন এই ককরোচদের নেতা। ধীরে ধীরে যন্তর মন্তরে ভিড় বাড়তে থাকে কমিউনিস্ট, কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রী ও আন্দোলনজীবীদের। কাশ্মীরের বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী-সহ দেশবিরোধী জেহাদিরা এই আন্দোলনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আন্দোলনকারীরা স্লোগান তোলে— 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কুরুচিকর শব্দ প্রয়োগ-সহ অশ্রাব্য গালিগালাজে মেতে ওঠে আরশোলার দল। এই আন্দোলনে যোগ দেন প্রযুক্তিবিদ ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। গত ২৮ জুন থেকে তিনি অনির্দিষ্টকালের অনশন শুরু করেন। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পরীক্ষায় অনিয়মের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে 'জেন-জি' নেতৃত্বাধীন সিজেপি-র আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তিনি এই অনশন শুরু করে ছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতির আশঙ্কায় অনশনের ২১তম দিনে, গত ১৮ জুলাই সোনম ওয়াংচুককে যন্তর মন্তর থেকে সরিয়ে নয়াদিল্লির সফদরজং হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করেছিল দিল্লি পুলিশ। তাঁকে আটক ও হাসপাতালের বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে আইনি পদক্ষেপের পর নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য ওয়াংচুককে গুরুগ্রামের মেদান্তা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী— গত ২৪ জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নাড্ডা এবং ড. জিতেন্দ্র সিংহ মেদান্তা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে লিখিত আশ্বাস পাওয়ার পর তিনি তাঁর ২৬ দিনের অনশন ভঙ্গ করেন।

ওয়াংচুককে হাসপাতালে স্থানান্তরের পর গত ২০ জুলাই ককরোচ জনতা পার্টির ডাকে 'সংসদ চলো' অভিযানে সামনে আসে এই আন্দোলনের প্রবল হিংসাত্মক রূপ। দেশের রাজধানী নয়াদিল্লিতে চরম অরাজকতা সৃষ্টি করে ককরোচ জনতা পার্টি ও রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির এই জোট। গত ২৫ জুলাই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করলে আন্দোলনের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পায়। কোনো শান্তিপূর্ণ আন্দোলন যদি বিদেশি মদতপুষ্ট দেশবিরোধী শক্তি ও ভাড়াটে দুষ্কৃতীদের প্রভাবে পরিচালিত হতে শুরু করে এবং তা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়, তখন আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য আড়ালে চলে যায়। আর রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির উদ্দেশ্যই মুখ্য হয়ে ওঠে।

ভারতবাসীকে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে, যাবতীয় ভেদাভেদ ভুলে দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, আত্মমর্যাদাবোধ ও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এবং 'আত্মনির্ভর ভারত' নির্মাণের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশ, জাতি, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে প্রত্যেক ভারতীয়কে নিবেদিতপ্রাণ করতে হবে।

এমন পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষ থেকে প্রণীত বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার ও ইতিবাচক উদ্যোগও ছাত্রদের কাছে অপ্রতুল বা অযৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হতে পারে। আন্দোলন তখন মূল দাবি থেকে বিচ্যুত হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিংসাত্মক ঘটনার রূপ নিতে

পারে। বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ, সরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর আক্রমণের ঘটনাও ঘটতে পারে। ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধীরে ধীরে দেশবিরোধী ও সমাজবিরোধী চরিত্র ধারণ করে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সাম্প্রতিক নিট ইস্যুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলনের কিছু অংশে এই প্রবণতার প্রতিফলন দেখা গেছে।

কেন্দ্রের বর্তমান সরকার সংসদে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে। ফলে মহিলা সংরক্ষণ বিল, ডিলিমিটেশন বিল, ওয়ান নেশন— ওয়ান ইলেকশন বিল, ইউনিফর্ম সিভিল কোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ও নীতিগত সংস্কার বাস্তবায়নের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে আরও কঠোর এফসিআরএ বিলটি পাশ হওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র, যেটা দেশবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত এনজিওগুলির সামনে অস্তিত্বের প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে পারে। ওই সমস্ত এনজিও (যারা বিদেশি আর্থিক মদতপুষ্ট এবং ভারতে সরাসরিভাবে ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়া ও টুকরে টুকরে গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত) ও তাদের মদতদাতা আন্তর্জাতিক চক্র ভোঁতা হয়ে পড়বে।

কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরপর তিনবার দেশের জনগণের সমর্থন লাভ করে ক্ষমতায় এসেছে। তাই, যারা গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তনে সফল হচ্ছে না, তাদের একাংশ বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে রেখে দেশে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে— এমন মতও অনেকের মধ্যে রয়েছে। তাদের এই কার্যকলাপ গণতন্ত্রের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে গণতন্ত্রকে হত্যা করার প্রচেষ্টা মাত্র।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত অনুযায়ী—নিট ইস্যু এই 'ছাত্র' নামধারী অরাজক শক্তির কাছে মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং বৃহত্তর নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের একটি হাতিয়ার মাত্র। উদ্দেশ্য হলো জন-অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ বা নেপালের মতো ভয়াবহ নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন কিংবা তথাকথিত Mobocracy বা Streetocracy-র মাধ্যমে 'রেজিম চেঞ্জ' সরকার পরিবর্তনের পরিস্থিতি তৈরি করা।

অন্যদিকে, এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ভারতের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং জাতীয় ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখতে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সংগঠন, সামাজিক শক্তি ও সাংস্কৃতিক মঞ্চ একটি সচেতন, সংগঠিত ও জাগ্রত সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। রাজনীতি-সচেতন, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে এটি শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং একটি জাতীয় কর্তব্যও। দেশপ্রেমিক ও রাষ্ট্রভক্ত যুবসমাজও এই দায়িত্ব পালনে সক্রিয় ভূমিকা নেবে— এটাই প্রত্যাশা। গত এক দশকে কাশ্মীর থেকে ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার, কৃষি আইন (২০২০), সিএএ-এনআরসি-ওয়াকফ ও সাম্প্রতিক নিট-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে অরাজক ও হিংসাত্মক আন্দোলনের সম্মুখীন হয়েছে ভারত। প্রতিটি ঘটনাতেই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে দেশের রাজধানী নয়াদিল্লি। এসব ঘটনার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে ভারতের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস)— জেনারেল বিপিন রাওয়াতের একটি পর্যবেক্ষণ প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

জেনারেল বিপিন রাওয়াত বলেছিলেন— ভারত বর্তমানে 'আড়াইটি ফ্রন্টের যুদ্ধ'-এর সম্মুখীন। তিনি বলেন যে, পাকিস্তান (প্রথম) ও চীন (দ্বিতীয়)-এর মতো বহিরাগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষমতা ভারতের রয়েছে। কিন্তু আড়াই-মুখী যুদ্ধের বাকি 'অর্ধেক ফ্রন্ট' বা অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ, যা কখনও প্রকাশ্যে, কখনও গোপনে পরিচালিত হয়— তা বেশি জটিল ও বিপজ্জনক।

বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, উগ্র মোল্লাবাদ, মাওবাদ, আরবান নকশাল, টুকরে টুকরে গ্যাং, কালচারাল মার্ক্সিস্ট, বিভিন্ন ইভাঞ্জেলিকাল গোষ্ঠী এবং অন্যান্য চরমপন্থী মতাদর্শের সমন্বিত কার্যকলাপ এই অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জকে জটিল করে তোলে। চীনের 'কালচারাল রেভোলিউশন' এবং ২০১০-পরবর্তী পর্যায়ে 'আরব বসন্ত'-এর সমন্বিত চিন্তাধারায় ২০১৪-র পর থেকে ভারতীয় সমাজকে ভাঙা ও 'রেজিম চেঞ্জ'-এর ধারাবাহিক প্রয়াস চলছে। ভারতে 'কালার রেভোলিউশন' ঘটানোর এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন এনজিও-র মাধ্যমে বিপুল আর্থিক মদত দিয়ে চলেছে গ্লোবাল ডিপস্টেট। সক্রিয় রয়েছে বিভিন্ন বিদেশি গুপ্তচর সংস্থা ও সামাজিক মাধ্যমের শীর্ষমহল। ককরোচ জনতা পার্টি সংগঠিত নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনে গ্লোবাল ডিপস্টেট-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার অভিযোগও বিভিন্ন মহলে ইতিমধ্যেই উত্থাপিত হয়েছে।

বিজ্ঞান, অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যবসা বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে বর্তমান ভারত। আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারতের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশের নাগরিকদের মধ্যেও জাতীয় চেতনা আরও সুদৃঢ় হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারত-বিরোধী শক্তিগুলিও আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে অনেকে মনে করেন। এই পরিস্থিতিতে বিভাজনমূলক শক্তিকে রুখতে কেবল প্রচলিত নিরাপত্তা কৌশল নয়, সময়োপযোগী সামাজিক ও বৌদ্ধিক প্রতিরোধও গড়ে তোলা প্রয়োজন। দেশের প্রতিটি গ্রাম, শহর ও নগরে সচেতন নাগরিকদের তথ্যভিত্তিক ও যুক্তিনির্ভর জনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশজুড়ে একটি সুসংগঠিত জাতীয়তাবাদী সামাজিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে, যা সবরকম বিভ্রান্তি, অপপ্রচার ও দেশবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

দেশবিরোধী শক্তিগুলি অতীতে আংশিক সাফল্য পেলেও ভবিষ্যতে নতুন নতুন ইস্যুকে সামনে এনে আবারও ব্যাপক অস্থিরতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে পারে। তাই সকলকে সর্বদা সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার দায়িত্ব দেশের সৎ, সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিকদেরই নিতে হবে। যাঁরা নিজেদের বৌদ্ধিক যোদ্ধা হিসেবে মনে করেন, তাঁদের পারস্পরিক যোগাযোগ, সংগঠন ও জনসচেতনতার মাধ্যমে একটি ইতিবাচক সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যাতে বিভাজনের রাজনীতি ব্যর্থ হয়।

প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী ভারতীয়কে নিজ নিজ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। আন্তরিক ও সৎ নাগরিকদের সঙ্গে নিয়ে সাংস্কৃতিকভাবে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন এবং 'বিশ্বগুরু' হিসেবে ভারতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁদের কাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখার পাশাপাশি দেশের ঐতিহ্য ও পরম্পরা রক্ষা হলো নতুন ভারতের নীতি ও লক্ষ্য। সমস্ত ভারতবাসীকে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে, যাবতীয় ভেদাভেদ ভুলে দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, আত্মমর্যাদাবোধ ও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এবং 'আত্মনির্ভর ভারত' নির্মাণের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশ, জাতি, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে প্রত্যেক ভারতীয়কে নিবেদিতপ্রাণ করতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সবার আগে দেশ— রাষ্ট্রহিত সর্বোপরি।

(লেখক হলদিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-র অধ্যাপক)

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা

প্রত্যেক বছরেই স্বস্তিকা পত্রিকায় শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা প্রকাশ করা হয় এবং পাঠক ঋদ্ধ হয়। এবারের সংখ্যাও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে আরও কিছু সংযোজন করা এবং দু'চারটি সংশোধন করে দেওয়ার জন্যই এই পত্রের অবতারণা।

পৃষ্ঠা-৯-তে সাভারকরের সঙ্গে নেতাজীর সাক্ষাতের তারিখ হলো ২২ জুন, আর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙের ৮০ বছরের প্রাসঙ্গিকতা আজও সমান, আর তার প্রতিরোধের জন্য গোপাল মুখার্জির কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্য। তবে হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গার্ডের অধ্যাপক নৃপতি কান্ত রায় বা সার্বিক ভাবে ভানু বসু, যুগলকিশোর ঘোষ, শতদল ঘোষ, ইন্দুভূষণ বিদ, বিজয় সিংহ নাহার, ইন্দু মিত্র, দানী বোস, ল্যাংড়া চিত্ত ও রাম চ্যাটার্জি প্রমুখের ভূমিকা আজকের দিনে স্মরণ করা উচিত। পৃষ্ঠা-১৫-তে যে বেঙ্গল পার্টিশন লিগের কথা বলা হয়েছে, তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জি ছাড়াও সদস্যদের মধ্যে অন্যতম হলেন, হেমন্ত কুমার সরকার, নলিনাক্ষ সান্যাল, যাদব পাঁজা, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির কুমার ব্যানার্জি, সুবোধ মিত্র, শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। উল্লেখ্য যে, অনেক স্থানে 'ডঃ' স্থলে 'ডজ্ঝ' মুদ্রিত হয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গ গড়ার দাবিতে নদীয়া জেলাকে বিভিক্ত করা হয়, কারণ এই জেলায় ৬১ শতাংশ মুসলমান ছিল। তবে ১৬ পৃষ্ঠাতে অন্যান্য জেলার মধ্যে কোচবিহারের নাম তথ্যগত ভুল রয়েছে। পৃষ্ঠা-৪১-এ ১৯৫২ সালে নির্বাচিত ৯ জন সদস্যদের মধ্যে আট জন্যই মেদিনীপুর জেলার, অপর জন হলেন ২৪ পরগনার কুলপির প্রাণকৃষ্ণবাবু। মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যোগাযোগ ছিল আত্মিক সম্পর্ক। ১৯৫২ সালে লোকসভার আসন মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রার্থী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হন। ১৯৪৬ সালের ২৯ অক্টোবর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঢাকার নবাবকে সঙ্গে করে নিয়ে ঝড়ের পরিস্থিতি দেখতে মহিষাদলের রাজবাড়ি থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখেন শ্যামাপ্রসাদ। বিভিন্ন স্কুলের অনুমোদনে সহায়তা করেন, তেমনি নন্দীগ্রামের পুরুষোত্তম রামকৃষ্ণ সেবা সদনে পানীয় জলের সংকট নিরসনে নলকূপ স্থাপন করতে সহায়তা করেন। কাঁথিতে এলে সত্যব্রত মাইতি প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে করে নিয়ে আলোচনা করেন এবং কাঁথি কলেজের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করেন, অবশ্যই হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে। ১৯৫০ সালের ৩ জুন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর জেলা শাখার বার্ষিক সভার সভাপতিত্ব করতে দেখা যায়। মেদিনীপুর জেলায় এক গুচ্ছ সুহৃদ ছিল, তার মধ্যে অন্যতম হলো সুতাহাটার মুরারীমোহন মান্না।

—**রাধাকান্ত ঘোড়াই,**
ডাবুয়াপুকুর, পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর।

বর্ষাকালে শাক খাওয়ার ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা নেয়ার কারণ

শাক পুষ্টিকর খাদ্য হলেও বর্ষাকালে শাক খাওয়ার ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারণ এই সময় শাক থেকে জীবাণু সংক্রমণের ভয় থাকে। বর্ষাকালে বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকে। ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও পরজীবীর ডিম পাড়ার অনুকূল পরিবেশ রচিত হয়। ফলে শাকের পাতায় ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও পরজীবীর ডিম থাকার সম্ভাবনা থাকে। উপরন্তু বর্ষাকালে প্লাবিত জল অত্যন্ত দূষিত হয়। দূষিত জল রোগজীবাণু বহন করে। অনেক ক্ষেত্রেই চাষে এই দূষিত জল ব্যবহৃত হয়। ফলে এই সময় শাক থেকে রোগজীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাছাড়া এই সময় অনেক ক্ষেত্রে শাক-গাছের পাতায় ছোটো ছোটো পোকা, শামুক বা তাদের ডিম লেগে থাকে। ভালোভাবে পরিষ্কার করে না খেলে স্বাস্থ্যহানির ঝুঁকি থাকে। তবে এর অর্থ এই নয় যে বর্ষাকালে একেবারেই শাক খাওয়া যাবে না। শাক ভালোভাবে বেছে নিয়ে কয়েকবার পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে। প্রয়োজনে ১৫-১০ মিনিট লবণজল বা ভিনিগার মেশানো জলে ভিজিয়ে রেখে ধুয়ে নিতে হবে। কাঁচা শাক স্যালাড হিসেবে না খাওয়াই ভালো। রান্না করে খাওয়া নিরাপদ। ঝুঁকিটি মূলত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণু সংক্রমণ নিয়ে।

—**অজয় ভট্টাচার্য,**
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা।

প্রসঙ্গ : বন্দে মাতরম্

ইদানীং আমাদের গৌরবের মধ্যমণি রাষ্ট্রগীত বন্দে মাতরম্ গানের তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটি দুই রকমভাবে গাওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা আসা উচিত। এ বিষয়ে স্বস্তিকাকে অনুরোধ রাখবো, যথোপযুক্ত গাইডলাইনটি সবার সামনে রাখার জন্য। যেহেতু কালের নিয়মানুসারে জনসংখ্যার পরিবর্তন হয়েছে, সপ্ত কোটি থেকে কোটি কোটি; ঠিক তেমনি কেউ গাইছে 'অবলা কেন মা এত বলে।' আবার কেউ গাইছে 'কে বলে মা তুমি অবলে'। এটাই সঠিক ভাবনা থেকে অধিকতর যথোপযুক্ত মনে হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রগীত বলে কথা, এটা দু'রকম ভাবে চলতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে গীত হয়েছে 'কে বলে মা তুমি অবলে।' সংসদেও গাওয়া হয়েছে। এটাই তো যুক্তিসঙ্গত লেগেছে! তাহলে 'অবলা কেন মা এত বলে' এটাও কেন চালু রয়েছে? এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট গাইডলাইন অতি সত্তর আসা উচিত। কেননা বন্দে মাতরম্-এর গরিমা রক্ষার্থে সংসদে আইন পাশ হয়েছে। স্বস্তিকাকে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার জন্য বিনম্র অনুরোধ রাখছি।

—**গৌতম ধর,**
আগরতলা, ত্রিপুরা।

ফ ঃ ৩

পেট্রোলে ইথানল কুড়ি শতাংশ

আজ সবার মুখেই ঘুরপাক খাচ্ছে ই-২০, মানুষ জানতে চাইছে। আর সেই সুযোগ বুঝে রাজনৈতিক বাস্তুঘুঘুরা পথে নেমেছে। এরা কখনোই মানুষকে সঠিক কথা বলে না। অন্যদিকে নানারকম পোকা মাকড়ের পর জন্ম নিয়েছে ই-২০ জনতা পার্টি, হয়তো আরশোলাদের মতো এরাও পেট্রোলে ২০ শতাংশ ইথানলের জন্য আন্দোলন করবে। অবশ্যই দেশের সংবিধান সবাইকেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অধিকার দিয়েছে। কোনো সংগঠন যদি দেশভক্ত হয় তাহলে তারা কখনো আন্দোলনে অশান্তি বা হিংসাকে আমন্ত্রণ জানায় না।

আন্দোলন প্রথম দিকে এক রকম বা একমুখী থাকে। সেই আন্দোলন দানা বাঁধলেই সেখানে নানান ধরনের মানুষ, নানান মতবাদের মানুষ ও সুযোগসন্ধানীদের অনুপ্রবেশ ঘটে। তখন আন্দোলনের অভিমুখ পরিবর্তিত হয়। কালক্রমে আন্দোলন হিংসাত্মক হয়। গত শতাব্দীর ৭০ দশকের নকশাল আন্দোলন শুরু হয়েছিল বিভিন্ন নামি কলেজের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। সেখানে ছিল কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, ছিল বিভিন্ন মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। ছিল আন্দোলনের উজ্জ্বলতা ও মর্যাদা। কালক্রমে সেই আন্দোলনে 'তারকাটা'রা প্রবেশ করে। আজ থেকে ৬০ বছর আগে কলকাতা ও হাওড়ার সিইএসসি-র ওভারহেড তার সব তামার ছিল। যে চোরেরা ওই তার কেটে (চুরি) নিত তাদের বলা হতো 'তারকাটা'। সেই রক্তাক্ত নকশাল আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। আর অতি সম্প্রতি ককরোজ জনতা পার্টির আন্দোলনে তারকাটারা প্রবেশ করে হিংসা ছড়াতে শুরু করলেই, নরেন্দ্র মোদী সরকার ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ করিয়ে আন্দোলনের ইতি ঘটায়। মজার কথা, কংগ্রেস-কমিউনিস্ট- অখিলেশ ও মমতার দল ওই আরশোলার আড়ালে আশ্রয় নিয়ে 'প্রশ্ন ফাঁস' ইস্যুতে বাজার গরম করেছে কিন্তু সংসদে প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে কড়া বিল এলে তারাই তার বিরোধিতা করেছে। এটাই ওদের আসল চরিত্র। আসলে ওরা 'আন্দোলনজীবী'।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

প্রতিবাদ নাকি সভ্যতার দেউলিয়াপনা?

প্রতিবাদ বা আন্দোলনের একটা নিজস্ব শালীনতা ও গাম্ভীর্য থাকে, কিন্তু সম্প্রতি দিল্লির যন্তর মন্তরে যা ঘটছে, তাকে আর যাইহোক অধিকার আদায়ের লড়াই বলা চলে না। আন্দোলনের নামে লাগামহীন কটুভাষা, অসভ্যতা আর শিষ্টাচারহীন আচরণ আজ সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আর সবচেয়ে লজ্জাজনক বিষয় হলো, সমাজের একশ্রেণীর তথাকথিত প্রগতিশীল মানুষ এই উগ্রতা ও কটুভাষাকেই সাহসিকতার তকমা দিয়ে অন্ধের মতো সমর্থন করে চলেছেন। সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের দোহাই দেওয়া আমাদের সুশীল সমাজ কি এতটাই দেউলিয়া হয়ে গেছে যে, অন্যায্য কটূক্তি আর অশালীন ভাষাকেও আজ বিপ্লব বলে চালিয়ে দিতে হবে? যন্তর মন্তরে অবস্থানরত কিছু মহিলার মুখে যেভাবে ভাষার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করা হয়েছে, তা কোনো সুস্থ মানুষের লক্ষণ হতে পারে না। নিজের বক্তব্য পেশ করার জন্য গালাগাল বা কুৎসিত ভাষার প্রয়োগ কখনো বীরত্ব হতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয়, কিছু মানুষ ঘরে বসে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই কটুভাষী মেয়েদেরই নায়িকা বানিয়ে তুলছেন। অন্যায় বা দাবির বিরুদ্ধে কথা বলার লোক গণতান্ত্রিক দেশে অনেক আছে, কিন্তু সেই কথা বলার ধরন যদি উগ্র ও অশালীন হয়, তবে তা আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যকেই কলঙ্কিত করে।

যারা আজ যন্তরমন্তরের এই অশালীন আচরণকে বাহবা দিচ্ছেন এবং চোখ বুজে সমর্থন করছেন, তাঁদের দিকেই এবার সবচেয়ে বড়ো প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেওয়ার সময় এসেছে। যন্তরমন্তরে অবস্থানরত সেই কটুভাষী মেয়েগুলোকে যারা সমর্থন করছেন, তাদের সবার ঘরেই ঈশ্বর যেন ঠিক তাদের মতোই মেয়ে, পুত্রবধূ ও স্ত্রী উপহার দেন! কথাটি শুনতে চরম শ্লেষাত্মক মনে হলেও, এর ভেতরে লুকিয়ে আছে এক নগ্ন সত্য। মুখে নীতিবাক্য ঝাড়া খুব সহজ, কিন্তু যেসব সমর্থক এই কটুভাষী ও অনিয়ন্ত্রিত আচরণকে অধিকারের লড়াই বলে তালি মারছেন, তাঁরা কি সত্যিই চাইবেন তাঁদের নিজের ঘরের মেয়ে, স্ত্রী কিংবা পুত্রবধূও ঠিক একইভাবে তাঁদের সঙ্গে বা সমাজে এই কটু ভাষায় কথা বলুক? যদি তা না চান, তবে এই দ্বিমুখী নীতি ও ভণ্ডামি কেন? প্রতিবাদ করার অধিকার সবার আছে, কিন্তু ভাষার মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্বও একই সঙ্গে বজায় রাখতে হয়। কটুভাষাকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দিলে আগামী প্রজন্ম কেবল অসভ্যতা ও উগ্রতাই শিখবে। তাই এই ধরনের আচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া এখনই বন্ধ হওয়া উচিত। বিপ্লবের নাম করে উগ্রতা ছড়ানো বন্ধ না হলে এবং অন্ধ সমর্থকরা তাঁদের এই ভণ্ড মানসিকতা থেকে বেরিয়ে না এলে, সমাজ থেকে সম্মান, শ্রদ্ধা ও পারিবারিক মূল্যবোধ পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অন্যায়ের প্রতিবাদ হোক শালীনতার সঙ্গে, কোনো অসভ্যতার উদ্‌যাপনের মাধ্যমে নয়!

—শুভাশীষ পাইন,
পুয়াবাগান, বাঁকুড়া।

সুস্থ সাংগঠনিক পদক্ষেপ

মানুষ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবর্তন চেয়েছিল। পরিবর্তন এসেছে। তৃণমূলের অপশাসন থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে শুরু করেছে তারা। ইতিমধ্যে তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগে ২২ জনকে সাসপেন্ড করেছে বিজেপি। গত ৪ মে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন তোলাবাজি কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না। এটা তারা করে দেখালেন। জানা গিয়েছে, দল ২৫০ জনকে শোকজ করেছে। মানুষের দাবি এদের সবাইকে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক। এটাই বিজেপির সুস্থ সাংগঠনিক পদক্ষেপ।

—রাহুল দাস, হালতু, কলকাতা-৭৮।

গর্ভসংস্কার কোনো অলৌকিক বিষয় নয়। এটি এক পরম বিজ্ঞান। মায়ের হাসি, পুষ্টিকর খাবার এবং সদর্থক চিন্তাই পারে এই পৃথিবীকে একটি সুন্দর প্রজন্ম উপহার দিতে।

গর্ভসংস্কার

আগামী প্রজন্মের সোপান

হাসি দাশ

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আমরা আমাদের সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে রাজি থাকি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই প্রস্তুতির শুরুটা ঠিক কখন থেকে? বৈদিক শাস্ত্র এবং আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান উভয়েই আজ একবাক্যে স্বীকার করছে যে, একটি শিশুর শিক্ষা শুরু হয় মায়ের গর্ভ থেকেই। যাকে আমরা এককথায় বলি— গর্ভসংস্কার।

গর্ভাবস্থা মানে কেবল একটি শারীরিক পরিবর্তন নয়, এটি একটি নতুন জীবনের আহ্বান। একটি চেতনার অঙ্কুরোদ্গম। অনেক মা মনে করেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে শেখানো শুরু হবে। কিন্তু মহাভারতের অভিমন্যু বা ভক্ত প্রহ্লাদের কথা ভাবলে আমরা দেখি, গর্ভাবস্থাতেই তাঁরা জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা পেয়েছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, গর্ভস্থ শিশু ৫ মাস বয়স থেকেই শ্রবণ ক্ষমতা অর্জন করে এবং মায়ের প্রতিটি আবেগ ও অনুভুতির কম্পন অনুভব করতে পারে।

একজন মা গর্ভাবস্থায় যা ভাবছেন, যা দেখছেন বা যা শ্রবণ করছেন, সবটাই তাঁর অনাগত সন্তানের চরিত্রের ভিত্তি তৈরি করে। মা যখন শান্ত মনে কোনো পবিত্র মন্ত্র বা সদর্থক বাণী শোনেন, তখন তাঁর শরীরে যে হরমোন নিঃসৃত হয়, তা শিশুর মস্তিষ্কের কোষে গভীর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটি কেবল ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, এটি একটি সূক্ষ্ম বিজ্ঞান। মায়ের প্রসন্নতাই সন্তানের শ্রেষ্ঠ সুরক্ষা কবচ। মায়ের ভাবনাও সন্তানের ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকে।

গর্ভসংস্কার কেবল মায়ের একার দায়িত্ব নয়। পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব রয়েছে। একটি সুস্থ ও সংস্কারিত শিশুর জন্য প্রয়োজন একটি সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ। পরিবারের সদস্যদের মনে রাখতে হবে যে, হবু মায়ের আনন্দ ও মানসিক শান্তিই আগত শিশুর শ্রেষ্ঠ উপহার। বাড়িতে কলহমুক্ত, শান্ত ও ভক্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখাই হলো শ্রেষ্ঠ সংস্কার।

মায়ের আহার : যেমন অন্ন, তেমন মন। গর্ভাবস্থায় মায়ের খাদ্যতালিকা কেবল শরীরের জন্য নয়, শিশুর বুদ্ধির বিকাশের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। যতটা সম্ভব টাটকা, বাড়িতে তৈরি এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত। অতিরিক্ত তেল মশলা বা বাসি খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো। লাল, হলুদ, সবুজ, সাদা— এই চার প্রকার শাকসবজি ও ফলমূল খাদ্য তালিকায় নিয়মিত রাখা প্রয়োজন। ঋতুভেদে ফল প্রতিদিন। দুধ ও পর্যাপ্ত জল পান জরুরি। মনে রাখতে হবে, মা যা খাচ্ছেন, শিশুটি তার মাধ্যমেই জীবনের স্বাদ গ্রহণ করছে।

বিশ্রাম ও ঘুম : গর্ভাবস্থায় মায়ের পর্যাপ্ত বিশ্রাম মানেই শিশুর সঠিক শারীরিক গঠন। প্রতিদিন অন্তত ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা শান্তির ঘুম প্রয়োজন। ঘুমানোর সময় শান্ত ও সদর্থক চিন্তা করা উচিত।

বিশ্রামের ভঙ্গি : বাম দিক ফিরে শোয়া রক্ত সঞ্চালনের জন্য সব থেকে ভালো, যা শিশুর শরীরে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছে দেয়।

ব্যায়াম ও প্রাণায়াম : শরীর ও মনের যোগসূত্র। শারীরিক সুস্থতা ছাড়া মানসিক শান্তি পাওয়া কঠিন। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী যোগাসন ও প্রতিদিন সকালে ও বিকালে ১৫ থেকে ২০ মিনিট পায়চারি করা শরীরের নমনীয়তা বজায় রাখতে সাহায্য করে। অনুলোম- বিলোম বা ভ্রামরী প্রাণায়াম করলে মায়ের মানসিক চাপ কমে এবং রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ে, যা সরাসরি শিশুর মস্তিষ্ককে সচল রাখে।

মানসিক শান্তি ও সৃজনশীলতা শিশুর চরিত্রের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। সৎ চিন্তা ও ভালো বই পড়া শিশুকে সমৃদ্ধ করে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও মন্ত্রোচ্চারণ শিশুর স্নায়ুতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলে। প্রতিদিন অন্তত ১০ মিনিট গর্ভস্থ শিশুর সঙ্গে কথা বলতে হবে তাকে জানাতে যে আপনি তাকে কতটা ভালোবাসেন। এটি শিশুর সঙ্গে আপনার আত্মিক বন্ধন মজবুত করবে।

গর্ভসংস্কার কোনো অলৌকিক বিষয় নয়। এটি এক পরম বিজ্ঞান। মায়ের হাসি, পুষ্টিকর খাবার এবং সদর্থক চিন্তাই পারে এই পৃথিবীকে একটি সুন্দর প্রজন্ম উপহার দিতে। আসুন, আমরা মায়েরা সচেতন হই এবং একটি আদর্শ সমাজ গড়ার শপথ নিই। □

সিক্‌ল্‌ সেল অ্যানিমিয়া মোকাবিলা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

ভারতে আনুমানিক ৭০৬টি জনজাতি সম্প্রদায় রয়েছে, যা দেশের মূল জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ। এই জনজাতি জনগোষ্ঠী আমাদের দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনজাতি সম্প্রদায় ছাড়া কখনোই সম্পূর্ণ হবে না।' ভারত সরকার জনজাতিদের নৈতিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং উপজাতীয় সংগঠনগুলির সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। জাতীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে জনজাতিদের সুস্বাস্থ্য ও উন্নয়নে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

সিক্‌ল্‌ সেল রোগ ভারতের জনজাতি সম্প্রদায়ের সামনে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ। এটি এমন এক জিনগত অসুখ, যেখানে কোনো ব্যক্তির লোহিত রক্তকণিকা বিকৃত হয়ে কাস্তের মতো আকার ধারণ করে। পূর্ববর্তী সরকারগুলি এই জিনঘটিত রোগ প্রতিরোধের তেমন প্রয়াস চালায়নি। তাই ইতালি, জাপানের মতো বিভিন্ন দেশ যেখানে এই রোগ প্রতিরোধ সক্ষম হয়েছে, সেখানে ভারত এখনও এর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। দেশ থেকে সিক্‌ল্‌ সেলের অভিশাপ নির্মূল করতে ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় বাজেটে 'সিক্‌ল্‌ সেল অ্যানিমিয়া এলিমিনেশন মিশন ২০৪৭'—শীর্ষক জাতীয় প্রচারাভিযানের ঘোষণা করা হয়েছে।

মানবদেহে সিক্‌ল্‌ সেল রোগ দু'ভাবে থাকতে পারে। এর মধ্যে একটিতে রোগের কোনো উপসর্গ দেখা যায় না, আক্রান্ত ব্যক্তিরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সিক্‌ল্‌ সেলের বিভিন্ন উপসর্গ প্রকাশ পায়। দেশের ১৩টি রাজ্য— রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরলম্, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রে এই রোগের প্রকোপ বেশি। চারটি রাজ্য বিহার, অসম, উত্তরাখণ্ড ও উত্তরপ্রদেশেও এর আংশিক প্রকোপ রয়েছে।

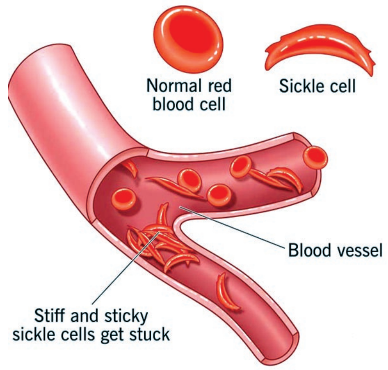

সিক্‌ল্‌ সেল ডিজিজে আক্রান্ত একজন ব্যক্তি ক্রমাগত ব্যথা, ক্লান্তি, রক্তাল্পতা-সহ অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হন, যা তাঁর জীবনযাত্রার ওপর গভীর ছাপ ফেলে। সিক্‌ল্‌ সেলজনিত রক্তাল্পতা দূর করার জন্য দু'ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রথমটি প্রতিরোধের ওপর জোর দিয়ে সদ্যোজাত শিশুরা যাতে এতে আক্রান্ত না হয়, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালায়। দ্বিতীয় পন্থায় যারা ইতিমধ্যেই এই রোগে আক্রান্ত তাদের চিকিৎসা ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের চেষ্টা করা হয়। সিক্‌ল্‌ সেল অ্যানিমিয়া আক্রান্ত রোগীরা যাতে যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবা পান তা নিশ্চিত করতে একটি সার্বিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে।

সিক্‌ল্‌ সেল বৈশিষ্ট্যযুক্ত দু'জন ব্যক্তি যদি একে অপরকে বিয়ে করেন, তাহলে তাদের সন্তানের মধ্যে এই রোগ সঞ্চারিত হওয়ার তীব্র আশঙ্কা থাকে। তাই বিয়ের আগে সিক্‌ল্‌ সেলের পরীক্ষা করলে এই রোগের বিস্তার আটকানো সম্ভব। রাজ্যগুলি এবং জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে ১৭টি রাজ্যের প্রায় ২০০টি জেলায় বসবাসকারী জনজাতি ও অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত মানুষজনের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে সিক্‌ল্‌ সেল আক্রান্তদের চিহ্নিত করার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এর আওতায় ৪০ বছর বয়সসীমা পর্যন্ত প্রায় ৭ কোটি মানুষের পরীক্ষা করা হবে। বৃহৎ এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশ থেকে সিক্‌ল্‌ সেল রোগ নির্মূল করা। চিহ্নিত করার পর আক্রান্তদের স্থানীয় ভাষায় স্মার্টকার্ড প্রদান করা হবে। এর ফলে একজন সহজেই বুঝতে পারবেন, বিয়ে করলে ভবিষ্যতে তাদের সন্তানের সিক্‌ল্‌ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় আশঙ্কা রয়েছে কিনা।

এই সম্পূর্ণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন, এতে মানুষজনের অংশগ্রহণ এবং এই সংক্রান্ত সচেতনতার ব্যাপক প্রসার সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্তরে নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার পর তাদের নিয়মিত পরীক্ষা, চিকিৎসা ও ওষুধ, অন্যান্য রোগের জন্য টিকাদান, খাদ্য তালিকাগত সহায়তা এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। এছাড়া স্বাস্থ্য কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণ এবং সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮ সাল থেকে দেশে ১ লক্ষ ৬০ হাজার স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে, যা কোভিড-১৯-এর মতো অতিমারির মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অন্যান্য রোগের সঙ্গে ওই রোগ নির্মূলেও এই কেন্দ্রগুলি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সিক্‌ল্‌ সেল রোগীরা যাতে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পান, সেজন্য এই কেন্দ্রগুলির স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২৭ জুন মধ্যপ্রদেশে সিক্‌ল্‌ সেল অ্যানিমিয়া নির্মূল মিশনের সূচনা করেছেন। সিক্‌ল্‌ সেল অ্যানিমিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এই উদ্যোগ অপরিসীম শক্তি জোগাবে। সিক্‌ল্‌ সেল রোগীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে।

এই মিশন, ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশ থেকে সিক্‌ল্‌ সেল অ্যানিমিয়া নির্মূল করার পথ প্রশস্ত করবে বলে সকলের বিশ্বাস। এর ফলে দেশের ঐতিহ্যকে যাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছেন, সেই জনজাতি সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ ও অস্তিত্ব রক্ষাও সুনিশ্চিত হবে। ☐

হাওড়া জেলা ক্রীড়া ভারতীর পরিচিতি বর্গ

গত ১ আগস্ট হাওড়া জেলার ক্রীড়া ভারতীর 'পরিচিতি বর্গ' অনুষ্ঠিত হলো তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দিরে। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ২৫৫ বর্গে অংশগ্রহণ করেন। তারমধ্যে ৩০ জন জাতীয় স্তরের খেলোয়াড়, স্কুল-কলেজের ক্রীড়া বিভাগের শিক্ষক ৪০ জন, বিভিন্ন ধরনের খেলার প্রশিক্ষক ২৫ ছিলেন। বর্গে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর সর্বভারতীয় সহ-সম্পাদক মধুময় নাথ, দক্ষিণবঙ্গের সভাপতি বিশিষ্ট পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস, সম্পাদিকা জয়ন্তী সরকার মণ্ডল, সহ-সম্পাদক বিশিষ্ট ভারোত্তোলক তথা খড়্গপুর আইআইটি-র স্পোর্টস্ অফিসার কৌস্তভ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত টোলির সদস্য সুকুমার সরকার, হাওড়া জেলা সভাপতি আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভাগ সংযোজক শুভেন্দু সরকার। পরিচিতি বর্গে সকলে মিলে গ্রামে গ্রামে ক্রীড়া ভারতীর সদস্য বৃদ্ধি, কবাডি খেলার প্রশিক্ষণদান, ক্রীড়া জ্ঞান পরীক্ষায় অংশগ্রহণে উৎসাহ দান এবং ক্রীড়াকেন্দ্র বৃদ্ধির সংকল্প নেওয়া হয়। বর্গে ২২ জনের হাওড়া জেলার নতুন সমিতি গঠন করা হয়। জেলা সভাপতি আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জেলা সম্পাদক হিসেবে সুরজিৎ মান্নার নাম ঘোষণা করা হয়। এরপর জাতীয় স্তরে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত সাতজন খেলোয়াড়কে সম্মানিত করা হয়। মধুময় নাথ ক্রীড়া ভারতীর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কাজ সম্পর্কে আলোচনা করেন। বর্গে আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে ক্রীড়া ভারতীর কাজকে বিস্তার করতে সকলকে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

সংস্কার ভারতী মেদিনীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে নটরাজ বন্দনা

গত ১২ই শ্রাবণ সংস্কার ভারতী মেদিনীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরের বকশিবাজার সরস্বতী শিশুমন্দিরে আদিগুরু নটরাজবন্দনা অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়। শুরুতেই সংস্কার ভারতীর ভাবসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। নটরাজের মূর্তিতে মাল্যার্পণ করার পর উপস্থিত সকলেই পুষ্প নিবেদন করেন। এর পর নাট্যকর্মী ও মৃৎশিল্পী সুভাষ কর্মকার এবং অঙ্কনশিল্পী গোষ্ঠ পাখিরা মহাশয়কে চন্দনের টিপ দিয়ে, উত্তরীয় পরিয়ে, পুষ্পস্তবক, নারিকেল, পান-সুপুরি, ছাতা, মিষ্টির প্যাকেট ও স্মারক হাতে তুলে দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন সভাপতি আশিস কর্মকার এবং পূর্বতন সভাপতি বর্তমানে উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য পুর্ণেন্দু মাঝি। সম্মাননা জ্ঞাপনের পর সুভাষবাবু ও গোষ্ঠবাবু দুজনেই বক্তব্য রাখেন। তারপরে পুর্ণেন্দু মাঝি

এবং শিশুমন্দিরের আচার্যা রুচিরা রায় গুরুপূর্ণিমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এরপর গান, নাচ, আবৃত্তি ও সমবেত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। নিশীথ প্রামাণিক নাটকের সংলাপ বলেন এবং নাটক সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ভাষণ রাখেন। দেশনা চক্রবর্তী ও দেবাঙ্গী মুখার্জির নৃত্য সকলকে মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সভাপতি আশিস কর্মকার। শান্তিমন্ত্রোচ্চারণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএমএস-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

প্রবল বৃষ্টি ও দুর্যোগ উপেক্ষা করে গত ২৩ জুলাই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্‌যাপিত হলো ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (বিএমএস)-এর ৭২তম প্রতিষ্ঠা দিবস। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ অনুমোদিত 'পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সঙ্ঘ'-এর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের উদ্যোগে এদিন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সংগঠনের অফিসের সামনে বিএমএস-এর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। পরে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের একটি সভাগৃহে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক গীত 'জনসেবা যে কর্ম আমাদের, ধর্ম আমাদের মানবতা' পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে এদিনের সভার সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে বিএমএস-এর কর্মীদের পাশাপাশি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ-এর নদীয়া জেলা ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন 'পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সঙ্ঘ'-এর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট সম্পাদক সঞ্জীব রায় ও সহ-সভাপতি শম্ভু দাস। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ গণেশ বাসফোর, বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তা বিধান রায় ও সন্দীপ কুমার শার্দূল, পশ্চিম২বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সঙ্ঘের প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক ডঃ সুশান্ত মজুমদার। আলোচনাসভাটির সভাপতিত্ব করেন ইউনিট সভাপতি নিত্যরঞ্জন মালো।

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, সংগঠনের দর্শন, শ্রমিক-কল্যাণ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় স্বার্থে সংগঠনের ভূমিকা এবং সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা পদ্মভূষণ দত্তোপন্ত বাপুরাও ঠেংড়ীজীর চিন্তাধারার বিষয়ে এদিনের সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বক্তারা দাবি করেন যে, শ্রমিক-স্বার্থ ও জাতীয়তাবাদী আদর্শকে সামনে রেখে বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ।

পুরুলিয়ার ভগবান বীরসা শাখার স্বয়ংসেবক সুজয় বসুর 'ওয়ারলি শিল্পশৈলী'তে অঙ্কিত চিত্র।

বহরমপুরে এনএমও-র জেলা সম্মেলন

গত ১ আগস্ট মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশন (এনএমও)-র সাংগঠনিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে আগামী কার্যক্রমের রূপরেখা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী সুমনা সরকার, প্রতিমন্ত্রী গার্গী ঘোষ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মুর্শিদাবাদ বিভাগ সঙ্ঘচালক অনিল কুমার ঘোষ, স্থানীয় বিধায়ক কাঞ্চন মৈত্র-সহ ভরত ঝাওর, ডাঃ নির্মল সাহা,ডাঃ অনাদি রায়চৌধুরী, ডাঃ মৃন্ময় অধিকারী। সম্মেলনে জেলার বিশিষ্ট চিকিৎসক, ডাক্তারি ছাত্র এবং চিকিৎসা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অন্যতম আকর্ষণ ছিল ডাঃ কৌশিক ঘোষের লেখা বই 'জীবিকা'-র উন্মোচন। সম্মেলনের সহায়তায় ছিল 'মেডিভিশন'-সহ ছত্রপতি শিবাজী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট।

গাজোলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রক্তদান

মালদা জেলার গাজোলের স্বয়ংসেবক তথা ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত টোলির সদস্য কাজল কুণ্ডুর মাতৃদেবী স্বর্গীয়া মিনা কুণ্ডুর প্রয়াণ ও বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মালদহ সেবা ভারতী এবং গৌড় সংস্কৃতি উত্থান ট্রাস্টের সহযোগিতায় গত ২ আগস্ট এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৪৭ জন রক্ত দান করেন। রক্তদাতাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ফলের চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়। এদিন একই সঙ্গে শ্রীকুণ্ডুর বাসভবনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পরিচালনায় শান্তিযজ্ঞ ও শ্রীগুরুমহারাজের ভোগারতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঘাকশোল ভারত সেবাশ্রমের মঠাধ্যক্ষ স্বামী বৈবস্বতানন্দ মহারাজ-সহ ২২ জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গৌড় সংস্কৃতি উত্থান ট্রাস্টের সভাপতি রামেশ্বর পাল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সেবা প্রমুখ দীপঙ্কর কমল বর্মা, মালদা বিভাগ সঙ্ঘচালক পীযূষকান্তি সাহা, বিভাগ প্রচারক অধীন সিংহ, সংস্কার ভারতীর মালদা জেলা সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, ভূপেশ চন্দ্র বর্মন, গাজোলের বিধায়ক চিন্ময়দেব বর্মন প্রমুখ। উপস্থিত সকলকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

সংস্কার ভারতী উত্তর কলকাতা জেলার নটরাজ পূজন

গত ২ আগস্ট নাগেরবাজার অজিতেশ মঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে সংস্কার ভারতী উত্তর কলকাতা জেলার নটরাজ পূজন এবং বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান তিনটি সত্রে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম সত্রের সূচনা সংগঠনের ভাবসঙ্গীত এবং অতিথিদের নটরাজ ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে হয়। সংগঠনের প্রান্ত কার্যকরী সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য প্রাস্তাবিক ভাষণ রাখেন। মঞ্চাসীন অতিথিদের মধ্যে রাজ্যের মন্ত্রী ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী, ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল, বিধায়ক তরুণজ্যোতি তেওয়ারী, পীযূষ কানোরিয়া, রুদ্রনীল ঘোষ এবং বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ সুদীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা ডঃ আশিস গিরি তাঁদের মনোজ্ঞ ভাষণ সকলের সামনে উপস্থাপিত করেন। সবশেষে উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি সুভাষ চন্দ্র ভট্টাচার্যের ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং সৃজিত মাজির বন্দে মাতরম্ গানের মাধ্যমে প্রথম সত্রে সমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় সত্রের সূচিতে ছিল উত্তর কলকাতার বিভিন্ন শাখার সাংস্কৃতিক পরিবেশন। উত্তর কলকাতার অন্তর্গত পাঁচটি শাখা— মানিকতলা, বাগুইআটি, দেশবন্ধুনগর, বরানগর ও দক্ষিণেশ্বর তাদের সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে। এছাড়া নটরাজের ওপর একটি নৃত্যগীতিআলেখ্য পরিবেশিত হয়। পরিচালনায় ছিলেন বৈশাখী কুণ্ডু ও সঙ্গীতা দত্ত। উত্তর কলকাতার নাট্যগোষ্ঠীর সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য ঋষভ কোমল দে'র পরিচালনায় একটি একাঙ্ক নাটক পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন জেলা সম্পাদিকা দোলন চক্রবর্তী এবং জেলার সাহিত্য বিধা প্রমুখ সঞ্চিতা সরকার।

অনুষ্ঠানের শেষ তথা তৃতীয় সত্রের মূল আকর্ষণ সিম্ফনি গ্লোবাল বাংলার বন্ধন-এর পরিবেশিত অনবদ্য সুর মূর্ছনা। সিম্ফনি গ্লোবালের কর্ণধার তাপস কুমার পালের পরিচালনায় সঙ্গীতের বিভিন্ন যন্ত্রানুষঙ্গের যে অভাবনীয় মিলন ঘটেছিল তাতে সংস্কার ভারতী-সহ সেদিন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন প্রত্যেকেই একটি অভূতপূর্ব সন্ধ্যার সাক্ষী ছিলেন।

‘সর্ডিহা গ্রামীণ শ্রাবণী মেলা ২০২৬’-এর শুভারম্ভ

সর্ডিহা উদয়ন ক্লাব ও লাইব্রেরির উদ্যোগে সর্ডিহা বাংলো ময়দানে শুরু হয়েছে সর্ডিহা গ্রামীণ শ্রাবণী মেলা ২০২৬। ১ আগস্ট এই মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাণী ও মৎস্য সম্পদ মন্ত্রী মাননীয় রাজেশ মাহাত। সঙ্গে ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি তুফান মাহাত মহাশয়। পক্ষকালব্যাপী চলা এই মেলাকে কেন্দ্র করে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে নানাবিধ ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশু-মহিলা ও যুবকরা ছাড়াও স্থানীয় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে মেলাপ্রাঙ্গণ মুখরিত হচ্ছে প্রতিদিন। সমাজের বিশিষ্ট মানুষের উপস্থিতি ও মার্গদর্শনে উপস্থিত যুবসমাজকে উদ্দীপিত করছে। মাননীয় মন্ত্রী রাজেশবাবু ও বিজেপি সভাপতি তুফানবাবু তাঁদের ভাষণে মেলা উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই ধরনের গ্রামীণ মেলার মাধ্যমে গ্রাম্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে জনজাতি সমাজকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে আয়োজকদের অগ্রণী ভূমিকার প্রশংসা করেন তাঁরা। অনুষ্ঠানে অধিক সংখ্যায় মহিলা ও যুবকদের উপস্থিতি নজর কাড়ে তাঁদের। আগ্রহ প্রকাশ করেন, আগামীদিনেও এই ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরম্পরা যেন বজায় থাকে।

ARICHA®
since 1942
www.arichaindia.com

ফঃ ৪

'শ্রী সত্যানন্দ দেবায়তন'-এর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

গত ২৫ জুলাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাসমারোহে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর বিধানপল্লী-স্থিত 'সত্যানন্দ দেবায়তন'-এর ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপিত হয়। একই দিনে ছিল পরম পূজনীয়া শ্রীঅর্চনা পুরী মায়ের জন্মতিথি এবং এইদিনটি ছিল উল্টোরথযাত্রা। স্বাভাবিকভাবেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এদিন ছিল উৎসবের পরিবেশ। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আশ্রমে অগণিত ভক্তের সমাগম হয়। পূজাপাঠ, হোম, ভজনের মাধ্যমে শুরু হয় এদিনের অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য, শ্রীঅর্চনী পুরী মায়ের জন্মতিথি ও সত্যানন্দ দেবায়তনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ২১ থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, এর মধ্যে শ্রীগুরুপূর্ণিমার অনুষ্ঠানও ছিল। প্রতিদিনই ভক্তবৃন্দের আগমনে দেবায়তন মুখরিত হয়। সমবেত ভক্তদের হৃদয়ে এক পবিত্র অনুভূতি অনুভূত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ দেব ও শ্রীঅর্চনা পুরী মা দু'জনই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, তাই দেবায়তনের প্রতিটি অনুষ্ঠানেই সঙ্গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। শ্রীঅর্চনা পুরী মা প্রায় চার হাজার সঙ্গীত রচনা ও সুরারোপ করেছেন। এবারও প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন--- স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত, রামানুজ দাশগুপ্ত, সংহিতা বসু। শ্রীঅর্চনা পুরী মায়ের রচিত সঙ্গীতের ওপর একটি গীতি আলেখ্য 'দেশাত্মবোধ ও জাতীয় সংস্কৃতি' পরিবেশন করেন অনির্বাণ দাস ও দীপ্তম সিনহা বিশ্বাস। 'বিস্তার'-এর ছাত্র-ছাত্রীরা সরোদ-সেতারে আসর জমিয়ে দেন। সাতদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রতিদিনই শ্রী অর্চনা পুরী মা রচিত ও সুরারোপিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রত্যেক শিল্পী। প্রতিদিনই দু'বেলার প্রসাদের ব্যবস্থা রাখা হয় ভক্তদের জন্য। দেবায়তনের ৫০ বছর পূর্তি, শ্রী অর্চনা পুরী মায়ের জন্মতিথি, শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথি, উল্টোরথ— সবই একই দিনে বা একই পক্ষে হওয়ার কারণে এবারের অনুষ্ঠান সবার মনের মণিকোঠায় অমলিন হয়ে থাকবে। অনুষ্ঠানের একটি দিনে দেবায়তনে উপস্থিত হয়েছিলেন যাদবপুরের বিধায়িকা শ্রীমতী শর্বরী মুখোপাধ্যায়। দেবায়তনের সঙ্গে তাঁর বন্ধনের বিষয়োল্লেখ-সহ শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ দেব ও শ্রীঅর্চনা পুরীর মা-কে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কলেজ স্ট্রিটে 'বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদ পরিচিতি বর্গ'

গত ২৭ জুলাই (১০ শ্রাবণ, ১৪৩৩) মধ্য কলকাতায় কলেজ স্ট্রিট-স্থিত মহাবোধি সোসাইটি সভাগৃহে সম্পন্ন হলো 'বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদ পরিচিতি বর্গ'। বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই কার্যক্রম পরিচালনা করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর প্রচারক নরেন্দ্রনাথ বেরা, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সহ-প্রচার প্রমুখ ডঃ জিষ্ণু বসু। পরিষদ পরিচিতি বর্গে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট লেখক, প্রকাশক, মুদ্রক, পুস্তক বিক্রেতা, সাহিত্যপ্রেমী-সহ বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদের সদস্যবৃন্দ। তিন জন কার্যকর্তা তাঁদের বক্তব্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদের সাংগঠনিক পরিচিতি উপস্থাপন করেন। বর্গ সঞ্চালনা করেন বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদের সম্পাদক দেবজ্যোতি চক্রবর্তী।

তুহিনা প্রকাশনীর পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ১৮ জুলাই উত্তর কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে তুহিনা প্রকাশনীর উদ্যোগে আয়োজিত হয় পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান। দেশাত্মবোধক ও আধ্যাত্মিক গ্রন্থসমূহ প্রকাশের এই মহতী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন— রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী মহারাজ, স্বামী নিগমানন্দ আশ্রম ভুবনেশ্বরের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতী মহারাজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ণমন্ত্রী ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী ও গৌরীশঙ্কর ঘোষ, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ জিষ্ণু বসু, পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্র মহাপাত্র, ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বরিষ্ঠ আঞ্চলিক অধিকর্তা ডঃ সুজাতা দত্ত হাজারিকা, বাবাসাহেব আম্বেদকর শিক্ষক শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ অরুণাশিস গোস্বামী এবং জাতীয়তাবাদী লেখক ও পরিবেশবিদ ডঃ মোহিত রায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণতম স্বয়ংসেবক ও পূর্বতন পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক স্বস্তিকার পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য, বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ড. মোহিত রায় এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে এদিন তুহিনা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তুহিনা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে তাঁদের উত্তরীয় পরিয়ে এবং শ্রীজগন্নাথ-শ্রীবলরাম ও মাতা সুভদ্রার প্রতিকৃতি সংবলিত স্মারক তাঁদের হাতে অর্পণ করে সম্মানিত করেন ড. কল্যাণ চক্রবর্তী। এদিন বিশিষ্ট অতিথিদের দ্বারা ২৫টি পুস্তকের আবরণ উন্মোচিত হয়। এদিন প্রকাশিত পুস্তকগুলি হলো—বনদেব মাজী রচিত 'বন্দে মাতরম্', দেবব্রত মল্লিক রচিত 'দক্ষিণেশ্বর', অনুপম যশ রচিত 'ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী : জীবন, সংগ্রাম ও আত্মবলিদান', সুদীপনারায়ণ ঘোষ রচিত 'ভারত সভ্যতার উপর পরিকল্পিত আক্রমণ', অমরেন্দ্র মহাপাত্র রচিত 'প্রসঙ্গ শবর জননী মহাশ্বেতা দেবী', কল্পনা সেন রচিত 'অবগুণ্ঠনের অন্তরালে', অজয় সেন ও কল্পনা সেন রচিত 'রামপ্রসাদ সেন ও বৈষ্ণবধর্ম', ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন রচিত ও ডাঃ দুলালকৃষ্ণ দাস সম্পাদিত 'রাজগৃহ ও নালন্দা', নিখিল পাণ্ডে রচিত 'নির্বাচিত প্রবন্ধ ও বিবিধ', শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'শতাব্দী জননী সারদা', ডঃ ইন্দ্রজিৎ সরকার রচিত 'আদি কবির অমর বাণী', অমলেশ মিশ্র রচিত 'Vidyasagar in the World Perspective', ডঃ গোপাল চন্দ্র মণ্ডল রচিত ও সুদীপনারায়ণ ঘোষ অনূদিত 'ব্যাঙ্কিং-এর সমাজতত্ত্ব', গোপাল চন্দ্র মণ্ডল রচিত ও ধ্যানেশ্বর ঘোষ অনূদিত 'রাজা রামমোহন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা', অপূর্ব চক্রবর্তী রচিত 'প্রণমি তোমারে', রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'A Blue Print for Survival & Revival of West Bengal', অস্মিতা চক্রবর্তী সম্পাদিত 'দুই লেখনী তিনটি জীবন', ডঃ জিষ্ণু বসু রচিত 'কেবলই যাতনাময়', গীতিকণ্ঠ মজুমদার রচিত 'গগনপুর স্বাস্থ্যবিতান', মানস করমহাপাত্র রচিত 'নীল খামের অভিশাপ' ও 'অপেক্ষার প্রহর', ড. মোহিত রায় রচিত 'বাংলাদেশ নিয়ে লেখালেখি', ড. কৌশিক কর্মকার কর্তৃক ভাষান্তরিত 'অচেতন গণতন্ত্র', ডঃ সুমনচন্দ্র দাস রচিত 'নিবেদিত প্রাণ' ও ডঃ সুমনচন্দ্র দাস রচিত ও সঙ্গীতা কর সম্পাদিত 'Unsung Heroes of India's Freedom Struggle'। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তরুণ লেখক দিগন্ত চক্রবর্তী।

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

বাদকুল্লায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মমহোৎসব উদ্‌যাপন

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ইঞ্জিনিয়ার গগনচন্দ্র বিশ্বাস বাদকুল্লার জমিদার ছিলেন। বাদকুল্লায় তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বাজার হলো 'গগনবাবুর বাজার'। গত ২ আগস্ট নদীয়া জেলার বাদকুল্লা গগনবাবুর বাজারে 'বাদকুল্লা ন্যাশনাল বয়েজ ক্লাব'-এর উদ্যোগে এবং গগনবাবুর বাজারের মালিক পক্ষের (গগনচন্দ্র বিশ্বাসের পরিবারের) আর্থিক সহায়তায় ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মমহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষ্যে এদিন বাদকুল্লা গগনবাবুর বাজার প্রাঙ্গণে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি দণ্ডায়মান মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করেন 'ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রিসার্চ ফাউন্ডেশন, নিউ দিল্লি'র চেয়ারম্যান ডঃ অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গগনচন্দ্র বিশ্বাসের প্রপৌত্র তরুণ বিশ্বাস, বাদকুল্লা ন্যাশনাল বয়েজ ক্লাবের সভাপতি শ্রীরঞ্জন বিশ্বাস ও ক্লাবের সম্পাদক দেবব্রত সরকার। ডঃ অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় -সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর স্রষ্টা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন-সংগ্রাম ও তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গানের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

মালদা কলেজ ও ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের উদ্যোগে গুরুপূর্ণিমা উৎসব উদ্‌যাপন

ভারতীয় সংস্কৃতিতে গুরু কেবল শিক্ষক নন, তিনি জ্ঞান, মূল্যবোধ ও মানবিকতার পথপ্রদর্শক। সেই চিরন্তন গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাহাত্ম্যকে স্মরণ করে গত ২৯ জুলাই ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল ও মালদা কলেজের যৌথ উদ্যোগে কলেজের সেমিনার গ্যালারিতে আয়োজন করা হয় গুরুপূর্ণিমা উৎসব। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রদীপ প্রজ্বলন করে ভারতমাতা এবং মা সরস্বতীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। মালদা কলেজের ছাত্র দীপ মুখার্জী ধ্যেয় শ্লোক এবং ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ প্রবাল বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্যেয়বাক্য পাঠ করেন। ছাত্রী সোমা মণ্ডলের কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' উপস্থিত সকলকে দেশপ্রেম ও সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। উদ্বোধনী পর্বে গুরুর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ডঃ বিপ্লব চক্রবর্তী ভারতীয় শাস্ত্রে গুরুর সর্বোচ্চ মর্যাদার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন মালদা কলেজের অধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ মানস কুমার বৈদ্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, গুরু কেবল পাঠদান করেন না; একজন শিক্ষার্থীর চরিত্র, নৈতিকতা ও জীবনাদর্শ নির্মাণেও তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা ও মূল্যবোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ কার্যবাহ তথা পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্যামল পাল। তিনি ভারতীয় গুরু-শিষ্য পরম্পরার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলেন, ভারতীয় জ্ঞানচর্চার মূল ভিত্তিই হলো গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মসমর্পণ ও অনুশাসনের চর্চা। এরপর কলেজের তিন শিক্ষার্থী— তনুশ্রী মিত্র, দীপ মুখার্জী ও পূজা কুণ্ডু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্য পুষ্পভরা' সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শেষ বক্তা ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক তথা গাজোল মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অমরচন্দ্র কর্মকার তাঁর ভাষণে ভারতীয় শিক্ষাদর্শের মূল ভিত্তি হিসেবে গুরুতত্ত্বের গুরুত্ব তুলে ধরেন। মূল্যবোধনির্ভর শিক্ষা এবং ভারতীয় জ্ঞানপরম্পরার পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। দীপ মুখার্জীর কল্যাণমন্ত্র পাঠের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

খনার বচন এবং বঙ্গের মৌখিক সাহিত্যের ধারা

সুশান্ত মজুমদার

দশে মিলে করি কাজ
হারি জিতি নাহি লাজ।
তেলা মাথায় ঢালো তেল,
শুকনো মাথায় ভাঙ্গ বেল।
পূর্ণিমা অমাবস্যায় যে ধরে হাল
তার দুঃখ হয় চিরকাল।
ষোলো চাষে মূলা,
তার অর্ধেক তুলা;
তার অর্ধেক ধান,
বিনা চাষে পান।

(অর্থাৎ ১৬ দিন চাষ করার পর সেই জমিতে মূলা চাষ করলে ভালো জাতের ফলন পাওয়া যায়। তুলা লাগানোর জমিতে ৮ দিন চাষ করতে হবে, ধানের জমিতে ৪ দিন চাষ করে ধান লাগালে ভালো ফলন পাওয়া যায়। পানের জমিতে চাষের প্রয়োজন হয় না।)

আগে খাবে মায়ে,
তবে পাবে পোয়ে।

(অর্থাৎ গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি হলেই তার গর্ভের সন্তানের পুষ্টি নিশ্চিত।)

যদি বর্ষে পুষে;
কড়ি হয় তুষে।

(অর্থাৎ পৌষে বৃষ্টিপাতের ফলে কৃষক তুষ বিক্রি করেও অঢেল টাকাকড়ির বন্দোবস্ত করবে।)

পূর্ণিমা অমাবস্যায় যে ধরে হাল তার দুঃখ হয় চিরকাল।

তার বলদের হয় বাত, ঘরে তার থাকে না ভাত।

(অর্থাৎ পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় হাল ধরা উচিত নয়, ধরলে চিরকাল দুঃখ পেতে হয়। বলদ বাত রোগে পঙ্গু হয়ে যায়, চাষ না করার ফলে ঘরে তার ভাত জোটে না।)

বাড়ির কাছে ধান গা, যার মার আছে ছা (অর্থাৎ বাড়ির কাছে ধানের জমি থাকলে এবং তাতে চাষ করলে লাভবান হওয়া যায় বেশি। কারণ চুরি যাবার ভয় থাকে না এবং পাহারা দেওয়ার জন্য পয়সা দিয়ে লোক রাখার দরকার হয় না।)

ওরে ও চাষার পো শরতের শেষে সরিষা রো।

খনার বচন সবচেয়ে বেশি প্রচলিত বাংলাভাষী কৃষক সমাজে যাদের কোনো লিখিত ভাষা নেই। মুখে মুখে প্রচলিত এসব ভাষা যুগ যুগ ধরে তাদের কৃষিকাজ ও জীবনাচারে প্রভাবিত হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বিষয়টিকে সোজা চোখে না দেখলেও খনার বচন তার অবশ্যম্ভাব্যতা থেকে কক্ষচ্যুত হয়নি।

(অর্থাৎ শরৎকালের শেষ দিকে সরিষার আবাদ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এতে লাভ পাওয়া যায়।)

শীষ দেখে বিশ দিন কাটতে মাড়তে দশ দিন।

(অর্থাৎ যে দিন ধানের শীষ বের হবে তার থেকে ঠিক কুড়ি দিন পর ধান কাটতে হবে। ধান মাড়াই ও ঝাড়াই করতে হবে দশ দিনের মধ্যে এবং তারপর নিয়ে গোলায় তুলবে।)

বিদুষী কন্যা খনার এইরূপ বচনগুলো হাজার বছরের বেশি সময় ধরে বাঙ্গালির লোকমুখে, লোককথায় অথবা পারিবারিক বা সামাজিক কথাবার্তায় বহুল প্রচারিত। বাংলা সাহিত্যের পর্যায়কাল ধরলে আদিযুগ (৬৫০-১২০০ খ্রিঃ), মধ্যযুগ (১২-১৮০০ খ্রিঃ) ও আধুনিক যুগের (১৮০০ খ্রিঃ বর্তমান সময় পর্যন্ত) সাহিত্যে খনার বচনের প্রভাব বেশ লক্ষণীয়। বঙ্গ তথা ভারতীয় সাহিত্যে খনাকে একজন বিদুষী মহিলা হিসেবে বিবেচনা করা হয় যিনি বিখ্যাত বচনগুলি রচনা করেছিলেন যা এখনো বাঙ্গালি সমাজে জনপ্রিয় যা 'খনার বচন' নামে বাঙ্গালির কাছে প্রসিদ্ধ। বিদুষী খনা একটি শুভ মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল ক্ষণা (মুহূর্ত) বা খনা।

তাঁর আসল নাম লীলাবতী বলে অনুমান করা হয়। কারণ বিদুষী লীলাবতীর যে গণিতশাস্ত্রের বই পাওয়া যায়, তাতে খনার ছাপ স্পষ্ট। ছোটো ছোটো সূত্রে তিনি গণিতের মূল কথাগুলো বলেছিলেন। 'অঙ্কস্য বামা গতি' অর্থাৎ অঙ্ক দক্ষিণ থেকে বাম দিকে গণনা করতে হয়। জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এক বিদুষী নারী যিনি তাঁর বচন রচনার জন্যেই বেশি সমাদৃত। মূলত খনার ভবিষ্যৎবাণীগুলোই

খনার বচনের নামে বহুল পরিচিত। মনে করা হয় ৮০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পাল বংশের শাসনামলে খনার আবির্ভাব হয়েছিল। কিংবদন্তি অনুসারে তিনি বাস করতেন পশ্চিমবঙ্গের অধুনা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাতের দেউলিয়া গ্রামে। তার পিতার নাম ছিল অটনাচার্য। খনার একটি বচনে এই পরিচয় পাওয়া যায়— 'আমি অটনাচার্যের বেটি, গণতে গাঁথতে কারে বা আঁটি'।

বিক্রমাদিত্যের দরবারে নবরত্ন সভার একজন অন্যতম রত্ন জ্যোতিষী বরাহর সুযোগ্য পুত্র মিহিরের স্ত্রী ছিলেন খনা। বিরল প্রতিভার আধিকারিণী খনা জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং বিষেশজ্ঞ জ্যোতিষী হয়ে ওঠেন।

প্রশ্ন একটা থেকেই যায়, খনা যদি সিংহলের কন্যা হয়েই থাকেন এবং উজ্জয়িনীতে শ্বশুরবাড়ি হয়, তবে বচনগুলো বাংলায় লিখলেন কী করে? সিংহলে বা উজ্জয়িনীতে তো বাংলা ভাষার প্রচলন ছিল না।

যদিও কোনো প্রমাণ নেই, তবে মনে করা হয়, খনা গণিত শাস্ত্রের যে ভাবে ছোটো ছোটো সূত্র লিখেছিলেন, সেই ভাবেই সংস্কৃতে এই বচনগুলো লিখেছিলেন। পরে সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করা হয়। বাংলায় অনুবাদ, চর্যাপদের আগেই হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

খনার বচন মূলত কৃষিতত্ত্বভিত্তিক ছড়া। আনুমানিক অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। আবহাওয়া, জ্যোতিষশাস্ত্র, ফসল, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি সম্পর্কে 'খনার বচন' নামে পরিচিত অনেক জনপ্রিয় উক্তি বাঙ্গালির সাহিত্য ও চিরাচরিত প্রাত্যহিক সমাজজীবনের অঙ্গ হয়ে আছে হাজার বছরের বেশি সময় ধরে। এই বচনগুলো পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

- কৃষিকাজের প্রথা ও কুসংস্কার।
- কৃষিকাজ ফলিত।
- জ্যোতির্বিজ্ঞান।
- আবহাওয়া জ্ঞান।
- শস্যের যত্ন সম্পর্কিত উপদেশ।

কৃষিক্ষেত্রে, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এবং প্রতিদিনের সামাজিক জীবনে একপ্রকার সংস্কার ও মূল্যবান উপদেশ হিসেবে মান্যতা পেয়েছে। খনার বচনের মাধ্যমে যে সংস্কার ও বাস্তব জ্ঞান দেওয়া রয়েছে তা আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে ভারতীয় সাহিত্য, উপন্যাস, কবিতা, লোকগাথা, লোককথায় খনার বচনের প্রসঙ্গ ও প্রভাব রয়েছে।

খনার বচন বাংলা ভাষার একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ মৌখিক সাহিত্য ঐতিহ্য। এটি বাংলা সাহিত্যের ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খনার বচনের বৈশিষ্ট্য এবং বঙ্গের মৌখিক সাহিত্যের ধারা নিম্নরূপ :

১. প্রাচীন উৎস : খনার বচনের উৎস প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে।

২. মৌখিক ঐতিহ্য : এটি মৌখিকভাবে প্রচলিত।

৩. কবিতা ও গান : খনার বচনে কবিতা ও গান রয়েছে।

৪. সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয় : এতে সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয় আছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে বচনগুলো শ্রেণীকরণ করে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কৃষিবিষয়ক বচন, তিলতত্ত্ব, হলুদবিষয়ক, কচুবিষয়ক, বৃষ্টি গণনা, কলাচাষ বিষয়ক ইত্যাদি। খনার এক বচন ছাড়া প্রচলিত অধিকাংশ রচনায় খনাকে 'ইতিহাসের এক নিষ্ক্রিয় ও প্রতিরোধহীন' ব্যক্তি হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে 'খনার জিহ্বা কেটে নেওয়ার ঘটনাকে' পুরুষতান্ত্রিক নিপীড়ন ও নারীর জ্ঞানকে প্রান্তিক করে তোলার উদাহরণ হিসেবে ব্যাখা দেওয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় দেখা যায় গ্রামীণ নিম্নবর্গের যাপিত জীবন ও শাসন বিকাশের আখ্যান।

গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের বাংলাভাষী মানুষের মৌখিক ও লোকসাহিত্যে খনার বচনের বেশ প্রভাব রয়েছে। এগুলোর প্রয়োগগত দিক বিবেচনার দাবি রাখে। এছাড়া সমকালীন সমাজজীবনের চিত্র, রাজার ভূমিকা, প্রজার কাজ, কৃষির গুরুত্ব, কৃষকের ভূমিকা, সমাজে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা বুঝতেও খনার বচনগুলো এক প্রামাণ্য আলেখ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে এই বচনের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে।

খনার বচন সবচেয়ে বেশি প্রচলিত বাংলাভাষী কৃষক সমাজে যাদের কোনো লিখিত ভাষা নেই। মুখে মুখে প্রচলিত এসব ভাষা যুগ যুগ ধরে তাদের কৃষিকাজ ও জীবনাচারে প্রভাবিত হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বিষয়টিকে সোজা চোখে না দেখলেও খনার বচন তার অবশ্যম্ভাব্যতা থেকে কক্ষচ্যুত হয়নি। বরং গ্রামের কৃষকরা বিজ্ঞানের ভাষার চেয়ে প্রবাদ-প্রবচনে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তবে অনেক বিজ্ঞজন খনার বচনকে আধুনিক বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করতে গিয়ে প্রবচনগুলো খনার বিজ্ঞান হিসেবে অভিজ্ঞান করেন। বচনগুলো অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে রচিত।

তবে আজও তা নির্ভুল ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন নীতিবাক্য হিসেবেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। সারা পৃথিবীর কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রকার মিশ্র বিষয় সম্বন্ধীয় বচনের জুড়ি মেলা ভার। কৃষিভিত্তিক বাঙ্গালি সমাজ ও সাহিত্যে এই বচনের প্রভাব আগামী কয়েকশো বছর থাকবে এই আশা রাখাই যায়। □

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

মহাভারতীয় রান্নাবান্না

রাজা নলের তৈরি মাংসান্ন

নন্দা ভট্টাচার্য

রন্ধন একটি শিল্প। ভারতীয় মননে রন্ধন, শিল্পের চেয়েও মহত্তম একটি বিদ্যা সাধনা। কেউ কেউ অন্যান্য অনেক কিছুর মতোই রন্ধনকেও পঞ্চম বেদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। একথা সত্য, রন্ধনের উদ্দেশ্য কেবল রসনার তৃপ্তির জন্য রুচিকর পদ বিনির্মাণ নয়; নয় কেবল উদরপূর্তির জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত। তার উদ্দেশ্য তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু।

রাধুনি, পাচক বা সূপকার হতে পারেন নারী অথবা পুরুষ। তিনি যদি দিনগত পাপক্ষয়ের মনোবৃত্তিতে রান্নাবান্না করেন তাহলে তা রুচিকর নাও হতে পারে। প্রতিটি ভোজ্যপদের সঙ্গেই যখন মেশানো থাকে পাচকের হৃদয়ের ভালোবাসা, তখনই তা হয় স্বাস্থ্যকর ও উপাদেয়। প্রতিটি পদ রান্নার সময় তাঁর লক্ষ্য থাকে, ওগুলি যেন সুপাচ্য, রোগপ্রতিরোধক ও বলবীর্যবর্ধক হয়। অর্থাৎ পাচক কেবল রন্ধনকুশলীই হবেন না, তিনি হবেন খাদ্যের পুষ্টি, তার গুণাগুণ সম্পর্কে সুঅবহিত। স্বাস্থ্যবিদ্যাতেও রীতিমতো অভিজ্ঞ। অর্থাৎ তিনি হবেন একই সঙ্গে শিল্পী, পুষ্টিবিদ, চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীও। তিনি হবেন জীবনবেদী।

বৈদিককালে রন্ধনশিল্পের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হতো। তবে তখনকার পাকপ্রণালী সম্পর্কে বিশদ বিবরণের রয়েছে যথেষ্ট অপ্রতুলতা। সেসব আছে মহাকাব্যের যুগের সাহিত্য ও নানা রচনায়। মহাভারতে পাণ্ডবঘরনি দ্রৌপদী ছিলেন রন্ধন-পটিয়সী। তাঁর তৈরি খাবার খেয়ে সকলেই ধন্য ধন্য করতেন। আজও কুশলী মহিলা রন্ধনশিল্পীকে বলা হয় রান্নায় যেন দ্রৌপদী।

সে যুগে পুরুষরাও ছিলেন অতি দক্ষ পাচক— অনেকটা এখনকার দিনের 'শেফ'-দের মতো। তাই বেশিরভাগ রাজ বা অভিজাত পরিবারেই রন্ধনের ভার থাকত পাচকদের ওপর। পেশাদার পাচক ছাড়াও মহাভারতের বহু নায়কই ছিলেন দক্ষ রন্ধনশিল্পী। ওই গুণের জন্যই অজ্ঞাতবাসের সময় রাজা বিরাটের পাকশালায় বল্লভ নামে পাচনের কাজ নেয় মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন। ভীমের রান্না সম্পর্কে নানা তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে মহাভারতে। তবে ওই সময়ের সবচেয়ে কুশলী সূপকার ছিলেন সম্ভবত নিষধরাজ নল। তিনি 'পাকদর্পণ' নামে রন্ধন প্রণালীর একটা গোটা বই-ই লিখে ফেলেন। এগারো অধ্যায়ে সাতশো শ্লোকে লেখা বইটি আজও ভারতীয় বন্ধন শিল্পের অনন্য নজির। 'পাকদর্পণে' শুধু বিভিন্ন

পদ রান্নার প্রণালীই নেই, আছে কী কী গুণ থাকলে একজন যোগ্য পাচক হওয়া যায় তারও কথা। ওইসঙ্গে প্রতিটি পদের আয়ুর্বেদিক গুণাগুণের কথাও বলা হয়েছে সবিস্তারে।

নিষধরাজ নল এবং বিদর্ভ রাজকন্যা দময়ন্তী ছিলেন এক সুখী-দম্পতি। কিন্তু কলির প্রকোপে সর্বহারা হয়ে তাঁরা হন বনবাসী। সেখানেও কলির চক্রান্তেই প্রায় অর্ধনগ্ন স্ত্রী দময়ন্তীকে ফেলে অন্যত্র চলে যান রাজা নল। অবশেষে আসে কলির প্রকোপ থেকে মুক্তি পাওয়ার সময়। রাজা নল দাবানল থেকে বাঁচান কর্কোটক নামে এক নাগকে। আগুন থেকে উদ্ধার পেয়েই কর্কোটক দংশন করে রাজাকে। বিষের জ্বালায় কলি পালিয়ে যায় রাজার দেহ ছেড়ে। রাজাও হন বিরূপ। কর্কোটক বলে, রাজার মঙ্গলের জন্যই এই দংশন। উপযুক্ত সময়ে তাকে স্মরণ করলেই রাজা ফিরে পাবেন পূর্বরূপ এবং সব সম্পদ। ওই সময় নলকে রাজা ঋতুপর্ণের কাছে আশ্রয় চাইতে বলে বিষধর ওই নাগ নেয় বিদায়।

কর্কোটকের কথাতেই বাহুক নামে রাজার সারথি ও পাচকের কাজ নেন রাজা নল। জানান, তাঁকে রান্না শিখিয়েছে স্বয়ং যমদেব। সেসব পদের রন্ধনপ্রণালী নিয়ে তিনি লিখেছেন 'পাকদর্পণ' নামে একটি বই। তাতে আছে নানা ধরনের ভাত রাঁধার কৌশল, আছে ডাল, মাংস, পায়েস ও বিভিন্ন রকমের মিষ্টি তৈরির প্রণালী। রান্নার মূল উপকরণ ঘি ও নানা মশলা তৈরির কথাও আছে বইটিতে।

রাজা নল মাংস-ভাত বা পলান্ন (পোলাও) রান্নার যে পদ্ধতির কথা বলেছেন, তার অনেকটাই আজকের বিরিয়ানির মতো। উৎক্রণোদক ও সামান্য মাংসোদন-এর সঙ্গে বিরিয়ানির পার্থক্য খুঁজে বের করা একটু কঠিনই।

বিরিয়ানির উৎস পারস্যে। মুঘল আমলে এটি ভারতে আসে। বলা হয়, সম্রাজ্ঞী মমতাজ এক সময় সেনাশিবিরে অপুষ্টিকর খাবার দেখে মাংস মিশ্রিত ভাত তৈরির নির্দেশ দেন। সেই মাংস মিশ্রিত ভাত-ই নাকি বিরিয়ানির আদিপুরুষ।

এবার দেখা যাক। 'পাকদর্পণে' বর্ণিত মাংসভাতের দু'টি পদ উৎক্রণোদক এবং সামান্য মাংসোদন-এর রন্ধন প্রণালী,—

উপকরণ :

শালি ধানের চাল। আয়ুর্বেদে বর্ণিত সুগন্ধি অতি পুষ্টিকর ওষধি গুণ- সম্পন্ন এক বিশেষ প্রজাতির ধান থেকে তৈরি এই চাল খুবই দামি। এটি শক্তিবর্ধক, রোগ প্রতিরোধক ও রক্ত পরিশুদ্ধক। এটি রাজাদের ভোজ্যচাল হিসেবে রাজান্ন নামেও পরিচিত। লোহা ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এই চাল ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রকও।

চাল ছাড়া অন্যান্য উপকরণের মধ্যে আছে ছাগ, মেষ, কুক্কুট বা মোরগ, লাব বা কোয়েলের মতো পাখির মাংস, কুষ্ম্ভী (কোম্বের বা ককুম্বা ফল), কস্তুম্ভরী বা ধনে ইত্যাদি মশলা; গাওয়া ঘি, সৈন্ধব লবণ, কেয়াজাতীয় সুগন্ধি ফুল, এলাচ-দারুচিনি-লবঙ্গর মতো কিছু মশলা এবং কস্তুরী ও ভোজ্যকর্পূর।

রন্ধন প্রণালী :

পরিষ্কার পাত্রে চাল এবং সমপরিমাণ জলে প্রথমে ভাত তৈরি করতে হবে। ভাত সেদ্ধ হলে মাংস ও কুম্ভী, কস্তুম্বরী বা ধনে ইত্যাদি মশলা দিতে হবে। সবকিছু সেদ্ধ হওয়ার পর সুগন্ধি ফুল ভেজানো জল, সামান্য কস্তুরী ও কর্পূর মিশিয়ে বদ্ধ পাত্রে সব কিছু আরও কিছুক্ষণ দমে রাখতে হয়। এইভাবে তৈরি মাংস মিশ্রিত ভাতের নাম উৎক্রান বা উৎক্রণোদক।

মোটামুটি উৎক্রণোদক তৈরির পদ্ধতিতে তিনভাগ জল ও একভাগ ভেজানো সাদা চাল পাত্রে নিয়ে তা উনুনে বসাতে হবে। চাল আধসেদ্ধ হলে তাতে চালের সমপরিমাণ মাংসসৈন্ধব লবণ মাখিয়ে গাওয়া ঘিয়ে ভেজে পুরো বা আধা রান্না অবস্থায় ওই পাত্রে দিতে হবে। তারপর ওইভাত ও মাংস সমেত পাত্রটি ঝাঁকিয়ে সব খাবার ওপর-নীচ করে মন্দাগ্নিতে দমে রাখতে হবে আরও কিছুক্ষণ। সবকিছু সুসিদ্ধ হলেই তৈরি হয়ে যাবে সামান্য মাংসোদন।

পাকদর্পণের প্রথম অধ্যায়ের ৬৫ থেকে ৭৯ শ্লোকে রয়েছে এই রন্ধনপ্রণালী।

রাজা নল লিখেছেন, এই ধরনের পদ ত্বকের শক্তি বাড়ায়; বীর্যবর্ধক, পুষ্টিকর, লঘুপাচ্য ও বলবর্ধক, এই পদে রক্তও পরিশুদ্ধ হয়।

বোঝা যাচ্ছে সেকেলে ওই মাংসভাত বা পলান্ন অনেকটা বিরিয়ানির মতোই রুচিকর আবার স্বাস্থ্যবন্ধুও। □

বাংলাদেশে গত ছ'মাসের সাম্প্রদায়িক হিংসার তথ্য প্রকাশ করেছে ঐক্য পরিষদ

।। ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ।। বাংলাদেশে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে (১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন) ২৫৭টি সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে বাংলাদেশে জেহাদি হিংসার শিকার হয়েছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২৬১ জন মানুষ। গত ২৭ জুলাই ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য তুলে ধরেছে 'বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের লিখিত বক্তব্যে বলা হয় যে, গত ৬ মাসে ৪০টি ঘটনায় হত্যার শিকার হয়েছেন ৪৪ জন হিন্দু। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ বা গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে পাঁচটি। ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাটের ৬২টি ঘটনা ঘটেছে। উপাসনালয়ের জমি দখল বা দখলের চেষ্টার ঘটনা ১৫টি। বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর, লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ৪৭টি। অপহরণ, তোলাবাজি ও নির্যাতনের ঘটনা ১০টি। মজহব অবমাননার অভিযোগে গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের ঘটনা ৯টি। জোরপূর্বক দখলের ঘটনা ২১টি। অন্যান্য ঘটনা ছয়টি।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিগত ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বর— এই ৫ মাস, ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর— এই ১২ মাস এবং চলতি বছরের প্রথম ৬ মাস— এই ২৩ মাসের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে বলা হয়, এ সময়ে মোট ২৯৬৩টি ঘটনার ৭৩.৭ শতাংশ সংঘটিত হয়েছে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পরবর্তী ৫ মাসে। ২০২৪-এর ৫ আগস্ট জেহাদি অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার সরকারের পতন ঘটে, ড. মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। এই সময়কালটি ছিল ব্যাপক আকারের জেহাদি হিংসার পর্যায়। হামলার মূল লক্ষ্য ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বসতবাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মস্থান। ২০২৫ সালে সংঘটিত হয়েছে মোট ঘটনার ১৭.৬ শতাংশ। ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে সংঘটিত হয়েছে মোট ঘটনার ৮.৭ শতাংশ। ২০২৪ সালের জেহাদি হিংসার মাত্রা ২০২৫ সালের তুলনায় প্রায় ৪.২ গুণ বেশি ছিল। মোট হিংসাত্মক ঘটনার প্রায় ৭০ শতাংশ ছিল বাড়িঘর, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হামলা; প্রায় ১০ শতাংশ ঘটনা ধর্মীয় উপাসনালয়কে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছে; প্রতি ২১টি ঘটনায় গড়ে ১ জন মানুষ নিহত হয়েছে; প্রতি ১০টি ঘটনার মধ্যে প্রায় ১টি ধর্মস্থানের উপর হামলা ছিল।

সাংবাদিক সম্মেলনে ২০২৫ সালের ১২ মাস এবং ২০২৬ সালের প্রথম ৬ মাসের সাম্প্রদায়িক হিংসার চালচিত্র তুলে ধরে বলা হয়— হিংসার ঘটনা প্রায় একই রকম ভাবে অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে তুলনামূলকভাবে ২০২৬ সালে হত্যার শিকার, উপাসনালয়ে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগ; হামলা, হত্যার হুমকি ও নির্যাতন; উপাসনালয়ের জমি দখল ও দখলের চেষ্টা ২০২৫ সালের চেয়ে বেশি। ২০২৪, ২০২৫ ও ২০২৬ সালের ঘটনার চালচিত্র তুলে ধরে তুলনামূলক পর্যালোচনায় বলা হয়— মোট ঘটনার সংখ্যা পরবর্তী ১৮ মাসে কমলেও হত্যাকাণ্ড, নারী নির্যাতন, সম্পত্তি দখল ও ইসলাম অবমাননার কথিত অভিযোগে হয়রানির ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ হিংসা, গণআক্রমণ থেকে লক্ষ্যভিত্তিক নির্যাতনে রূপান্তরিত হয়েছে। এটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তার জন্যে একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। ২০২৬ সালের প্রথম ৬ মাসের তথ্যে দেখা যায় যে, হিংসাত্মক ঘটনার সামগ্রিক সংখ্যা স্থিতিশীল থাকলেও প্রাণহানি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলার হার উদ্বেগজনকভাবে অব্যাহত রয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা ও উপাসনার অধিকারের উপর সরাসরি আঘাত

হানা হয়েছে এ সময়। এসব ঘটনা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার জন্যে দীর্ঘমেয়াদি বিপদ। ২০২৬ সালে প্রতিমাসে গড়ে হত্যা, উপাসনালয়ে হামলার হার ২০২৫ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্পত্তি দখলের হার কিছুটা কমলেও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। বিগত ২০২৪ সালের আগস্ট মাস থেকে ২০২৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ২৩ মাসে ২০৫৫টি ঘটনায় বাড়িঘর ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে বহু পরিবার জীবিকা হারিয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সংকটে পড়েছে। সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর ও বাস্তুচ্যুতি বৃদ্ধি পেয়েছে, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে, সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে, সামাজিক সম্প্রীতির অবক্ষয় ঘটেছে, আইন ও বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থা হ্রাস পেয়েছে।

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ কালীমন্দির চত্বরে ৮১ ফুট উচ্চতার শ্রীরামমূর্তি নির্মাণ করতে চেয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসা হরিদাসচন্দ্র তরণী দাসকে শেষপর্যন্ত কথিত অর্থপাচারের মামলায় গত ১২ জুলাই ২০২৬ রাতে গ্রেপ্তারের উল্লেখ করে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়— বেশ কিছুকাল যাবৎ যে উগ্র সাম্প্রদায়িক মহল দেবমূর্তি নির্মাণের বিরোধিতা করে এসেছে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে প্রবল আঘাত হেনেছে, সারা দেশজুড়ে মজহবি বিদ্বেষ ছড়িয়েছে— সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার্থে ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবসানে তাদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সাম্প্রদায়িক হুমকির শিকার হরিদাসচন্দ্র তরণী দাসকে গ্রেপ্তার নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক ও অগ্রহণযোগ্য এবং তা গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও ধর্মীয় স্বাধীনতার চরম পরিপন্থী। এহেন গ্রেপ্তারের ঘটনা বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে আন্তর্জাতিকভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে যা গোটা জাতির জন্যে দুর্ভাগ্যজনক। সাংবাদিক সম্মেলন থেকে অনতিবিলম্বে হরিদাসচন্দ্র তরণী দাসের আশু মুক্তির দাবি জানানো হয়। ঐক্য পরিষদের সাংবাদিক সম্মেলনে এ মর্মে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে, হরিদাসচন্দ্র তরণী দাসকে গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে সরকারই প্রকারান্তরে নির্মীয়মাণ শ্রীরামমূর্তির পূর্ণাঙ্গ রূপদানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে এটি হবে নিঃসন্দেহে সনাতনী সমাজের সাংবিধানিক ধর্মীয় অধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, যা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না।

সাংবাদিক সম্মেলনে বছর দুয়েক আগে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তারকৃত 'সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট'-এর মুখপাত্র প্রভু চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীরও মুক্তির দাবি জানানো হয়। বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, এমনকী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আধিকারিক-কর্মচারী, বিশেষ করে শিক্ষকদের গণহারে ও নির্বিচারে ছাঁটাই ও চাকরিচ্যুত করার কথা উল্লেখ করে দুঃখের সঙ্গে বলা হয় যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আমলেও আজ পর্যন্ত এর কোন প্রতিকার দৃশ্যমান নয়।

লিখিত বক্তব্যে (১) ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, বিবৃতি, মিথ্যা গুজব প্রচার বা এ ধরনের যাবতীয় অপপ্রচার বিশেষ ক্ষমতা আইনের ধারায় 'ক্ষতিকর কাজ' হিসেবে 'অপরাধ' গণ্য করে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ; (২) অনতিবিলম্বে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও জনজাতি সম্প্রদায়কে 'অধিকতর বিপদগ্রস্ত জনগোষ্ঠী' বিবেচনায় তাদের সামগ্রিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ এবং সাম্প্রদায়িক হিংসাকারীদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা; (৩) ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও জনজাতি সম্প্রদায়ের সামগ্রিক স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ, অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক উত্তরণের লক্ষ্যে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, বৈষম্যহীন ও মানবিক দেশ গঠন; (৪) ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের দাবি ৮ (আট) দফা অনতিবিলম্বে বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানানো হয়। ৮ (আট) দফা দাবির মধ্যে রয়েছে— সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন; জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন ও সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন; অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ প্রয়োগে যাবতীয় আমলাতান্ত্রিক বাধা অপসারণ করে ট্রাইব্যুনালের রায়ের আলোকে জমির মালিকানা ও দখল ভুক্তভোগীদের অনতিবিলম্বে, বরাবরের মতো প্রত্যর্পণ; বিগত সাত দশকের অব্যাহত নির্যাতন, নিপীড়ন, বৈষম্যের কারণে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 'অগ্রসরমান জনগোষ্ঠী থেকে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী'তে পরিণত হওয়ায় বিদ্যমান সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদের আলোকে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংসদে ৬০টি সংসদীয় আসন নির্ধারণ করে সংখ্যালঘুদের সরাসরি ভোটে সংখ্যালঘুদের জন্যে ৬০টি আসন সংরক্ষণ; দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণে আইন প্রণয়ন; বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং এর পাশাপাশি সকল জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও সরকারি সংস্থায় এবং পুলিশ-সামরিক বাহিনী-সহ সর্বস্তরে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হারে অংশীদারিত্ব-প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের যথাযথভাবে কার্যকর করা; সমতলের জনজাতিদের জন্যে পৃথক ভূমি কমিশন গঠন; সকল সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষকে ধর্ম পালনে অধিকতর উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সরকারি ছুটিসমূহের অতিরিক্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের শারদীয় দুর্গাপূজায় অষ্টমী থেকে দশমীতে ৩ দিন, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রবারণা পূর্ণিমায় ১ দিন এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ইস্টার সানডে'তে ১ দিন সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং ধর্মীয় ট্রাস্টসমূহকে বিলোপ করে ফাউন্ডেশনে রূপান্তরের দাবি জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন 'বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মণীন্দ্র কুমার নাথ। নির্মল রোজারিও, কাজল দেবনাথ ও ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়-সহ সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। □

ভারতকে অশান্ত করার ষড়যন্ত্র
বৈদেশিক মদতের চিত্রনাট্য

অর্ণব কুমার দে

বর্তমান ভারতে মাঝে মাঝেই কিছু মহান লোক জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁদের সাধারণের মাঝে জন্ম হয় না। জন্ম হয় চিত্রনাট্যের পাতায়। আইআইটি ও আইআইএম থেকে পাশ করা এক ব্যক্তি ২০০৪ সালে Five Point Someone... নামে একটি উপন্যাস লেখেন। ঔপন্যাসিকের নাম চেতন ভগত। রাজকুমার হিরানি নামের এক চিত্রনাট্য পরিচালক সেই গল্পটির ছায়া অবলম্বনে '3 idiots'-নামক একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন ২০০৯ সালে। সেখানে প্রধান চরিত্রের নাম হয় ফুংসুক ওয়াংরু। এই সিনেমাটি বেশ খ্যাতি লাভ করে। এ ঘটনার প্রায় ২৫ বছর আগে ১৯৮৪ সালে সোনম ওয়াংগিয়াল নামে লাদাখের এক ব্যক্তি, যিনি আবার জম্মু-কাশ্মীরের কংগ্রেসি ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিলেন। তিনি লাদাখিদের উপজাতি তকমার জন্য অনশনে বসেছিলেন। সেই অনশন ভাঙাতে ইন্দিরা গান্ধী গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। তারপর ওয়াংগিয়াল ন্যাশনাল কংগ্রেস থেকে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগ দেন। কংগ্রেস নেতা সোনম ওয়াংগিয়ালের সুপুত্র সোনম ওয়াংচুক এনআইটি (শ্রীনগর) থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে Student's Educational and Cultural Movement of Ladakh (SECMOL) নামের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেটি নাকি একটি সোলার পাওয়ার স্কুল। কী অদ্ভুত নাম তাই না! স্কুলের নামে 'মুভমেন্ট'। বরফের স্তূপ থেকে জল পাওয়া যাবে— এটি তার এক অনবদ্য প্রয়াস। এটি নাকি অভিনব উদ্যোগ! মানুষ আগে জানতেন না বরফ থেকে জল পাওয়া যায়। এরকম আবিষ্কার করলে তো পুরস্কার তো অবশ্যই প্রাপ্য। তাই আমেরিকা থেকে তাঁকে ২০১৮ সালে র‍্যামন ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এখানে বলে রাখা দরকার, র‍্যামন ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় সরকারি কাজ, জনসাধারণের কাজ, কমিউনিটি লিডারশিপ, সাংবাদিকতা, শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে উদ্যোগমূলক কাজ ও ইমারজেন্ট লিডারশিপের (উঠতি নেতৃত্বের) জন্য। কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য এই উপাধি দেওয়া হয় না।

এখন মানুষের যে রকম ভ্রম হয়— তা হলো, 'জলপাই কোথায়' আর 'জল পাই কোথায়'; সামাজিক মাধ্যমে এক ধরনের প্রোপাগান্ডার দৌলতে সাধারণ জনগণ '3 idiots'-এর ফুংসুক ওয়াংরু আর লাদাখের সোনম ওয়াংচুকের চরিত্রকে এক করে ফেলে। সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু এই সিনেমার ফুংসুক ওয়াংরু কোনো বিদেশি ভাবনা জারিত হয়ে বা কোনো রাজনৈতিক দাবি আদায় করতে লাদাখে যায়নি। কিন্তু বাস্তবে ওয়াংচুক কি এবার ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে বেনিয়মের প্রতিবাদে অনশনে বসেছেন? একথা সত্যি যে, নিট, সিবিএসই বা অন্যান্য কিছু পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র ফাঁস নিয়ে একটি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ককরোচদের উদ্দেশ্য কি সেই সমস্যার সমাধান? ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের বিধিবদ্ধ প্রয়াস, নাকি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়া ইমারজেন্ট লিডারশিপের পক্ষ থেকে দেশজুড়ে চরম অরাজকতা সৃষ্টির ছক? এ প্রশ্ন উঠছে কেন?

প্রথমত, ভারতীয় সংবিধানের ২৪৬ নং অনুচ্ছেদের অন্তর্গত সপ্তম তফশিল অনুযায়ী 'শিক্ষা' হলো কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের যৌথ তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে বহুবার বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ২০০৩ সালে ইতিহাসের প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে বলে দাবি করা হয়। মনে রাখতে হবে, তখন এত ইন্টারনেট বা ভিডিয়ো-ফোটোগ্রাফির চল ছিল না। আজ তা বেশ সহজলভ্য, তাই বিভিন্ন স্তরে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভবনা থাকে। বহুবার বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হলেও পশ্চিমবঙ্গে গত ৩০-৪০ বছর ধরে ক্ষমতাসীন কোনো সরকার এই দায় সরকারি ভাবে গ্রহণ করেনি। যদিও সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে এটা করাচ্ছে সেটা প্রমাণ করা কঠিন। তাও প্রশ্ন ফাঁস রুখতে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার অভাব ছিল স্পষ্ট। এমনকী এসএসসি শিক্ষা দুর্নীতির কারণে এরাজ্যে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে। সম্প্রতি নিট (ইউজি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই আর সিবিএসই পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, বাস্তবে এটি সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচারিত একটি গুজব ছিল মাত্র। তৃতীয়ত, ভারতের সংসদের দুই কক্ষে— লোকসভা ও রাজ্যসভায় এনিয়ে বিরোধীরা প্রশ্নোত্তর চাইতে পারতেন। তা না করে রাস্তায় অনশন কোনো সমাধান নয়। চতুর্থত, বিগত এক দশকে দেশে বিভিন্ন পরীক্ষায় ৮০ বার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে দাবি করা হচ্ছে। এই ৮০ বার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ১৫টি রাজ্য ও কেন্দ্র মিলিয়ে ঘটেছে বলে দাবি করা হচ্ছে, কিন্তু এর দায়ভার চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে পুরোপুরি কেন্দ্র সরকারের উপর। বিরোধী দলগুলি দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলিতে নিট (ইউজি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটলেও মজার বিষয় হলো, সোনম ওয়াংচুক-সহ পুরো ককরোচ গ্যাং সেই রাজ্যগুলির শিক্ষামন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবি করেনি। তাদের দাবি ছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ। কেন্দ্রীয় সরকার এইরকম প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো তথ্য কোনোদিনও প্রদান করেনি; অতএব '৮০' সংখ্যাটি সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক একটি সংখ্যা। একটি ইংরাজি সংবাদমাধ্যমে খবরটি প্রকাশিত হলেও, তা কোন রাজ্যে বা কোন পরীক্ষার বা কোন সময়ে ফাঁস হয়েছে, তার বিস্তারিত উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছে সেই সংবাদমাধ্যম। তাই এর সত্যতা

যাচাই করা সম্ভব নয়। এসব যুক্তি-তর্ক বাদ দিয়ে সাদা চোখে যদি মেনে নেওয়া যায়, যে সরকারি ব্যবস্থার মধ্যে সমস্যা আছে, তাহলে সোনম ওয়াংচুক হঠাৎ অসমর্থিত সূত্র ধরে অনশনে কেন বসতে গেলেন? তিনি 'তথ্যের অধিকার আইন'-এর সূত্র ধরে পরীক্ষক সংস্থার থেকে কোন সময়, কোন পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে, কোন রাজ্যে সেই ঘটনাগুলি ঘটেছে— এনিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে মানুষকে দিতে পারতেন। সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সহযোগিতা না করলে উচ্চ ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হতে পারতেন। সেই সঠিক তথ্য মানুষের সামনে এলে তাতে যেমন সাধারণ মানুষ উপকৃত হতো, তেমনি কেন্দ্র সরকারকে চাপে রাখা যেত। কিন্তু তা না করে তিনি যন্তরমন্তরে গিয়ে অনশন করলে কোন সমস্যার সমাধান হবে?

এবার উপরোক্ত বিন্দুগুলো যোগ করতে হবে— তাহলে চোরের উপর রাগ করে মাটিতে বসে ভাত খাওয়ার কারণ পরিষ্কার হবে। বিন্দুগুলি দেখে নেওয়া যাক।

সাম্প্রতিক কালে রাহুল গান্ধী বৈদেশিক বুদ্ধি ব্যবহার করে খুব সফল হচ্ছেন না। নানা কারণে তার ভাবমূর্তি বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। জাতীয় স্তরে বিরোধী নেতার মুখ ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না। জাতীয় স্তরের নেতৃত্ব হিসেবে মোদীজী-সহ এস. জয়শঙ্কর, অমিত শা বা যোগীজীর নামই উঠে আসছে।

গ্লোবাল ডিপস্টেটের ক্রীড়নক— এইরকম একটি বিরোধী মুখ চাই এবং তার অ্যাজেন্ডা হতে হবে ভারতের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত নানা সমস্যা সৃষ্টি করা। সমস্যা না থাকলেও তাকে সৃষ্টি করতে পারলে তাকে সবরকম মদত দেবে এই ভারত-বিরোধী স্বার্থান্বেষী আন্তর্জাতিক মহল।

এই সমস্যা সৃষ্টির সুযোগের অপেক্ষায় ছিল পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের 'ককরোচ' মন্তব্যকে নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে বোস্টনে অধ্যয়নরত অভিজিৎ দিপকে। খেয়াল রাখতে হবে যে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভিসা নিয়ে খামখেয়ালিপনার মাঝে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত অনেক ভারতীয় ছাত্র ভারতে আসতে যখন শঙ্কা বোধ করছেন, সেই সময়ে দিপকে ভারতে এসে আন্দোলন করার ছাড়পত্র পেয়ে যায় ও আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করে।

সোশ্যাল মিডিয়াতেই দিপকে তৈরি করে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)। সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিন সামাজিক মাধ্যমে ২০ লক্ষাধিক ফলোয়ার পেয়ে যায়। এখানে এসে যন্তরমন্তরে শিক্ষা নিয়ে 'আন্দোলন' শুরু করে দিপকে। কিন্তু সেখানে ২০০ জন মানুষের সমাবেশ দেখা যায় না।

এর মধ্যে ভারত সরকার সোনম ওয়াংচুককে ২০০৭ সালে সরকারি অর্থের বেনিয়ম করা নিয়ে চিঠি (Letter DCL/ NGO/06(704) dt 28.02.2007) পাঠায় এবং তার সংস্থার এফসিআরএ-অনুমোদন রদ হয়। এই চিঠির সূত্র ধরেই সোনম পুনর্বার এফসিআরএ রদের চিঠি পান ২৫/০৯/ ২০২৫-এ।

গত ২৮ জুন যন্তরমন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির সমাবেশে ওয়াংচুক তাদের দাবি সমর্থন করতে আসেন। কিন্তু সেদিনের সভা ভীষণ রকম ভাবে অসফল হওয়ায় তিনি বেশ হতাশ হন।

সাম্প্রতিক সময়কালটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, জাতীয় স্তরে ২০২৪ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি লোকসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে বিফল হয়। অথচ ২০২৬ সালে বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, ওড়িশা, পুদুচেরি ও অসমের মতো রাজ্যগুলিতে দারুণ ফল করে এবং পশ্চিমবঙ্গে অভূতপূর্ব ভাবে তৃণমূলের শিকড় উপড়ে ফেলে। তামিলনাড়ুতে বিজেপির চরম প্রতিদ্বন্দ্বী ডিএমকে-র পরাজয় জাতীয় রাজনীতিতে বিপক্ষ দলের কোমর বেশ নড়বড়ে করে দেয়। এবার হালে পানি না পেয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আশীর্বাদধন্য, বিদেশি ডিপস্টেট মদতপুষ্ট দিপকের আন্দোলনে নেমে পড়ে বাম, নকশাল ও বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী। আম আদমি পার্টির (আপ) নেত্রী অতিশি মার্লেনা, আপ-সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল যারা বিদেশ থেকে টাকা নিয়ে আপ দলটি সৃষ্টি করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে, সদ্য পরাজিত সিপিএম নেত্রী দীপ্সিতা ধর, টুকরে টুকরে গ্যাঙের সমর্থক বিজেতা দাহিয়া-রা হলেন ককরোচ আন্দোলনের মাথা যাদের দাবি হিন্দুরা ভারতে আতঙ্ক ছড়ায়। আরশোলাদের আন্দোলনে সমর্থন জানালেন অরুন্ধতী রায় যিনি কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হয়ে প্রচার চালান। এই রকম লোকজনের সমন্বয়ে প্রায় ২১ দিন ওয়াংচুক সংবাদ শিরোনামে থাকার প্রয়াস চালিয়েছেন। এবার প্রশ্ন হলো, এরা সবাই এক জায়গায় কেন? কারণ ইংরেজিতে একটি কথা আছে— 'Birds of a feather flock together' অর্থাৎ একই রকমের লোকজন এক জায়গায় সমাবেশ হয়। এরা সবাই এক রকমের লোক কীভাবে সেটা বুঝতে গেলে দেখতে হবে এদের কাছে জোগান হওয়া অর্থের উৎস বা এদের চিন্তাধারা কোথা থেকে আমদানি হয়েছে। ভারতে জাতপাত-ভিত্তিক বিভাজনের রাজনীতি বা উত্তর ভারত-দক্ষিণ ভারতের বিভাজন অথবা ভাষার বিভাজন ধীরে ধীরে কমে আসছে, ঠিক সে সময় ভারতবিরোধী শক্তিগুলি দেখছে ভারতকে অভ্যন্তরীণভাবে বিভাজিত না রাখতে পারলে ভারতকে বাগে রাখা সম্ভব নয়। তাই তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কালচারাল মার্ক্সিজ্‌ম্, উওকিজ্‌ম্, ইয়েলোইজ্‌ম্, এলজিবিটি, কাউন্টার কালচার, ক্যান্সেল কালচার ইত্যাদি তত্ত্বের উদ্ভাবন করে। এবার ঘুরপথে তার প্রসার করার জন্য কিছু মানুষকে আর্থিক মদত দেয়। তাদের এইসব বিকৃত ভাবধারায় একবিংশ শতাব্দীর ভারতে কংগ্রেস, সিপিএম, মাওবাদের মতো রাষ্ট্রবিরোধী দলগুলি পরিচালিত হয়ে থাকে। তাদের রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাওয়ায় 'আপ' দলের মতো দলকে তারা খাড়া করে। অন্যদিকে ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষিতে 'জম্মু-কাশ্মীর' হলো একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়, সেখানে অরুন্ধতীদের মতো আন্দোলনকারীদের তৈরি করে তাদের বিদেশি প্রভুরা। বাম ও অতিবাম শক্তি তাদের অ্যাজেন্ডা 'ভারত এক দেশ নয়'— তার প্রচার চালায়। চীন-মার্কিনিদের কাশ্মীরে প্রবেশ করা আটকাতে এবং তাদের 'চীন-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর' যাতে নির্বিঘ্নে চলতে থাকে তার জন্য পাকিস্তান-ভিত্তিক জেহাদি গোষ্ঠীগুলিকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত মদতের মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ চালায়। এই দুইয়ের অভিঘাতে ভারতে সৃষ্টি হয় 'আন্দোলনজীবী'র দল। ওয়াংচুক ২০০৭ সালে এফসিআরএ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং সেই বিষয়ে কেন্দ্র সরকার গত বছর তাকে নোটিশ পাঠানোর পর সব দেশদ্রোহী, অরাজক শক্তির একত্রিত হওয়ার সুযোগ বা অছিলা জেগে ওঠে। 'শিক্ষা' নয়, এক্ষেত্রে 'অর্থ'ই যাবতীয় অনর্থের কারণ। □

স্বাধীনতা সংগ্রামে সাংবাদিকদের ইতিহাস

সুজিত রায়

বাংলা সাংবাদিকতার জগতে নন্দলাল ভট্টাচার্য একটি উল্লেখযোগ্য নাম। শুধু সাংবাদিকতাতেই নয়, সাংবাদিকতা বিষয়ক নানা গ্রন্থ রচনা এবং সাংবাদিকতা শিক্ষা বিষয়কও কয়েকটি গ্রন্থের লেখক হিসেবে তিনি যথেষ্ট সুপরিচিত। 'স্বাধীনতা সংগ্রামী সাংবাদিক' গ্রন্থটি তাঁর সেই বৌদ্ধিক অবদানেরই অন্যতম। মোট দশটি অধ্যায় জুড়ে তিনি মূলত বাংলা সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষে অবদান বিষয়ে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক রোজনামচা উপস্থাপন করেছেন এই গ্রন্থে। বইয়ের প্রাথমিক পর্বে তিনি ভারতবর্ষের ওপর বিদেশি আগ্রাসনের দীর্ঘ বারোশো বছরের বঙ্গ ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন এবং সেই পরম্পরার পথ ধরেই আক্রমণ হেনেছেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে।

১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধ এবং একশো বছর পর মহাবিদ্রোহের উদ্দামতার পর ধীরে ধীরে ভারতীয়রা যে শেকল ছেঁড়ার গান গাইতে শিখেছিল সেই ইতিহাসকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন ভারতের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিময় আন্দোলনে সে যুগের সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকাগুলির ভূমিকার বিচ্ছুরণকে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ভারতের ইতিহাসের একটা বিশাল খণ্ডসম। সেই সংগ্রামে সংগ্রামীদের ইতিহাসে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ভূমিকা আরও একটি বিস্তারিত অধ্যায়। নন্দলাল ভট্টাচার্যের এই গ্রন্থে সেই দীর্ঘ ইতিহাসের অবতারণার মধ্য দিয়েই তুলে ধরেছেন মূলত সেইসব সাংবাদিকদের যাঁদের নাম মানুষ মনে রাখেনি। যাঁদের নামে কোনো মূর্তি গড়া হয়নি, এমনকি তাঁদের সংবাদপত্রের রেপ্লিকাও বিভিন্ন

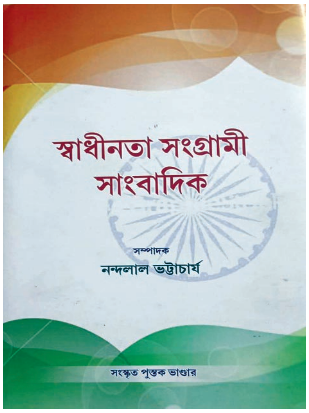

পাঠাগারে অথবা সংগ্রহশালায় দেখা যাবে না।

অর্থাৎ ইতিহাসের গভীরে পৌঁছে তিনি তুলে এনেছেন মণিমুক্তার মতো মূল্যবান সেইসব সংবাদপত্র ও পত্রিকাকে এবং সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের ভূমিকা যা অন্যান্য ইতিহাসের মতোই ধামাচাপা পড়েছিল দীর্ঘকাল। ইতিহাসের অজানা অচেনা অংশের উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গেই লেখক আবিষ্কার করেছেন বহু ঐতিহাসিক কাহিনির খনি যেগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকেই সম্মানিত করে আর চিনিয়ে দেয়— ভারত তথা বঙ্গ বিপ্লবের সেই প্রাথমিক পর্বেও ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাননি। অত্যাচারিত হয়ে চিৎকার করেছে কিন্তু প্রতিবাদের পথ থেকে দূরে সরে যাননি। জোর করে চাপানো আইনে বহু সাংবাদিক এক রাতেই পথের ভিখারি হয়েছেন কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোর জিদ ছাড়েননি। সেই সব অনবদ্য কাহিনি এযুগের কিশোর, তরুণ ও যুব সমাজকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারে। কারণ সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের লড়াই এখনো শেষ হয়ে যায়নি। পরিস্থিতি বদলেছে কিন্তু মূল আদর্শ আজও উড্ডীন হয়ে রয়েছে ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে।

বশংবদ সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের কিছু বাধ্যবাধকতা অবশ্যই আছে, কিন্তু দেশের সংখ্যাগুরু সংবাদপত্র বা পত্রিকাগোষ্ঠী এবং সামগ্রিকভাবে সব ধরনের মিডিয়া এখনো সততা ও সত্যের পথ থেকে দূরে সরে যায়নি। তাই লেখক তথ্য পেশ করে বুঝিয়েছেন বোধহয় সাংবাদিকদের এই প্রতিবাদী ও গঠনমূলক ভূমিকার জন্যই ২০০৬ থেকে ২০২০ পর্যন্ত গোটা বিশ্বে অন্তত ১২০০ জন সাংবাদিক খুন হয়েছেন। শুধুমাত্র ২০২১-এ ৬ জন সাংবাদিক নিহত ও ১০৮ জন সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, কারণ অন্যায় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদী সাংবাদিকের সংখ্যাও বাড়ছে। ২০২৩ সালে তাই আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২২৬ আর খুন হয়েছেন পাঁচজন।

গ্রন্থলেখকের এই তথ্য এখনো আশা জোগায় ভারতবর্ষের গণমাধ্যমগুলি আবার একদিন সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করেই 'ভারতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন' কেড়ে নেবে।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার একটি অতি পরিচিত ঐতিহ্যশালী প্রকাশনা সংস্থা। তাই বইয়ের সামগ্রিক উপস্থাপনার সমালোচনার বিশেষ সুযোগ নেই। তবু বলতেই হচ্ছে, প্রচ্ছদে ভারতবর্ষের পতাকা যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, গ্রন্থের বিষয়ের ভিত্তিতে সাংবাদিকতার অস্ত্র 'কলম'-এর ছবি থাকলে ভালো হতো। কারণ বইটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নয়; স্বাধীনতা সংগ্রামে সাংবাদিকদের ইতিহাস।

গ্রন্থের নাম : স্বাধীনতা সংগ্রামী সাংবাদিক। লেখক : নন্দলাল ভট্টাচার্য (বর্ষীয়ান সাংবাদিক)। প্রকাশক : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ২০২৫। মূল্য : পাঁচশো টাকা।

(লেখক সাংবাদিক, লেখক ও অধ্যাপক)

মন্থরক তাঁতি

এক গ্রামে মন্থরক নামে এক গরিব তাঁতি বাস করত। তাঁত বুনে অনেক কষ্টে তার সংসার চলত। সংসারে তার বউ আর দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে ছিল। তাদের সুখের জন্য তাঁতি দিন-রাত পরিশ্রম করত। কিন্তু তাঁতি খুবই ঢিলে স্বভাবের। তার হাত চলত না কিছুতেই। তাই অনেক খেটেও অভাব দূর করতে পারত না।

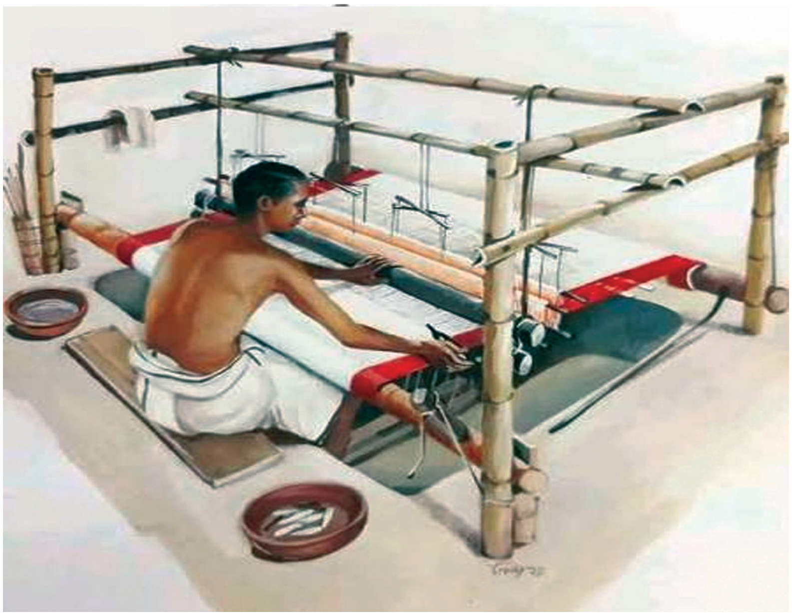

একদিন তার তাঁতের কাঠগুলি ভেঙে গেল। তাই তাকে জঙ্গলে যেতে হলো ভালো কাঠ জোগাড় করতে। জঙ্গলে মনের মতো কাঠ না পেয়ে সে ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলের মধ্যে একটি নদীর কাছে চলে এল। সেখানে একটি ভালো গাছ পেয়ে গেল। সে গামছাটি কোমরে ভালো করে বেঁধে কুড়ুল দিয়ে গাছটিতে কোপ বসাতে যাবে, অমনি কোথা থেকে কে যেন বলে উঠল— করো কী, করো কী? এ গাছ কাটবে না।

মন্থরক ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল, আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে। আসলে ওই গাছটায় অনেকদিন আগে এক যক্ষ আশ্রয় নিয়েছে। মন্থরক কাউকে না দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে হে? তোমাকে তো দেখতে পাচ্ছি না?

গাছের ভেতর থেকে গম্ভীর গলায় যক্ষ বলল, আমি এক যক্ষ। অনেক দিন ধরে এই গাছটায় বাস করছি। এই নদীর হাওয়ায় প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। তুমি বাপু এই গাছ কেটো না।

মন্থরকের তখন তাড়া রয়েছে। সে বলল, কাঠের আমার খুব দরকার, আমার তাঁতটি ভেঙে পড়ে আছে। সেটা ঠিক করতে না পারলে আমার সংসার কীভাবে চলবে? তখন যক্ষ বলল, ঠিক আছে, তুমি আমার কাছে কিছু চেয়ে নাও।

মন্থরক খুব খুশি হলো। তার মুখে হাসি আর ধরে না। সে ভাবল, চাইবার তো অনেক কিছু আছে। ঘরে তো খুব অভাব। তাই বুদ্ধি করে চাইতে হবে। সে যক্ষকে বলল, আমাকে একটু সময় দাও। আমি বাড়ি গিয়ে আমার বউকে জিজ্ঞেস করে আসি।

তাঁতি দৌড়ে বাড়ির দিকে চলল। তার মনে আনন্দ আর ধরে না। গ্রামে ঢোকার মুখেই দেখা হলো তার অনেককালের বন্ধু নাপিতের সঙ্গে। নাপিত শুনে বলল, তুমি যক্ষের কাছে গিয়ে বলো, তুমি রাজা হতে চাও। তুমি রাজা হলে আমি তোমার মন্ত্রী হয়ে বেশ ভালো-মন্দ খাবো আর পালঙ্কে শুয়ে স্বপ্ন দেখবো। বেশ সুখে কেটে যাবে জীবনটা।

তারপর মন্থরক এক ছুটে তার বাড়ি পৌঁছলো। বৌ বলল, কী হলো, কাঠ কোথায়? সে বলল, শোনো, আমি এক যক্ষকে বশ করেছি। তার কাছে আমি যা চাইবো সে তাই দেবে। আমার নাপিত বন্ধু বলল রাজা হবার কথা বলতে। তাহলে সে আমার মন্ত্রী হতে পারবে।

তাঁতির বৌ বিরক্ত হয়ে বলল, তোমার যেমন আক্কেল! রাজা হওয়া কী মুখের কথা? কত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে জানো? যুদ্ধটুদ্ধ লাগলে তুমি সামলাবে কী করে? তোমার বন্ধুর মাথায় যদি একটুও বুদ্ধি থাকতো! না, না। ওসব বেআক্কেলে পরামর্শে রাজি হয়ো না।

তাঁতি খুশি হয়ে বলল, এজন্যই তো তোমার কাছে ছুটে এসেছি। এবার তুমি বলো আমি কী চাইবো। তাঁতির বৌ অনেক ভেবেচিন্তে বলল, তুমি তো তোমার দুটো হাত দিয়ে দুদিনে একখানা কাপড় বোনো। যদি তুমি তোমার পিঠের দিকে আর দুটি হাত আর একটি মাথা চেয়ে নাও, তাহলে তুমি দুদিনে দুটি কাপড় বুনতে পারবে। আর আমাদের অভাবও কিছুটা দূর হবে।

বৌয়ের কথা শুনে মন্থরক জঙ্গলের মধ্যে ওই গাছের কাছে গিয়ে বৌয়ের শেখানো কথাগুলো যক্ষকে বলল। বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁতি হয়ে গেল দুই মাথা, চার হাতওয়ালা মানুষ। সে এখন সামনেও দেখে, পেছনেও দেখে। কী সুবিধে। এখন তাড়াতাড়ি বৌকে দেখাতে পারলেই সুখ।

তাঁতি বাড়ির দিকে চলতে গিয়ে দেখে, সে এগোচ্ছে না পিছোচ্ছে বুঝতে পারছে না। মাথাটা যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে গাঁয়ের কাছাকাছি আসতেই দেখল একদল ছেলে মাঠে খেলা করছে। তারা হঠাৎ সামনে তাঁতির ওই কিম্ভুত চেহারা দেখে ভয়ে চিৎকার শুরু করে দিল। ছেলেদের হট্টগোল শুনে আশেপাশের বাড়ি থেকে বড়োরা লাঠিসোটা নিয়ে ছুটে এল। তারা মন্থরকের কোনো কথাই আর কানে নিল না। সকলে মিলে তাকে ঘিরে ধরে নির্দয়ভাবে মারতে মারতে একেবারে মেরে ফেলল।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

স্যাডল পিক

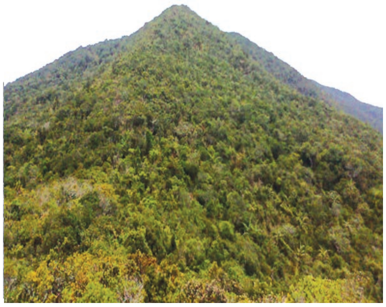

ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উত্তর আন্দামান দ্বীপের দিগলিপুরের কাছে স্যাডল পিক ন্যাশনাল পার্ক অবস্থিত। ৮৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই উদ্যানে রয়েছে আন্দামানের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ স্যাডল পিক (উচ্চতা ৭৩২ মিটার)। এটি ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্যানে ১০টি স্থায়ী এবং ১০০টির বেশি সাময়িক ঝরনা রয়েছে। আর্দ্র পর্ণমোচী বৃক্ষ ও বাঁশঝাড়ে পরিপূর্ণ এই উদ্যান। এই উদ্যানে রয়েছে বন্য শুয়োর, পাহাড়ি ময়না, বিভিন্ন প্রজাতির বাঁদর, বড়ো বড়ো গুইসাপ। এই উদ্যান ভ্রমণের সেরা সময় হলো নভেম্বর থেকে মার্চ মাস। প্রবেশমূল্য বড়োদের ২৫ টাকা এবং শিশুদের জন্য ১০ টাকা।

এসো সংস্কৃত শিখি-১২২

সম্বোধনম্— অকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ
(ভাগ:-१)

बालिका – बालिके! (বালিকা – ওহে বালিকা!)
छात्रा – छात्रे।
महिला – महिले।
गायिका – गायिके ।
सीता – सीते।
सुपर्ण – सुपर्णे।
बालिके! आगच्छतु। (ওহে বালিকা! এসো।)
सुनयने! पठतु।
विपासे! लितु
सुमित्रे! गायतु
अनीते! उपविसतु
(এভাবে বাক্য রচনা করতে হবে)

ভালো কথা

কেশব শাখা

গত ২৬ জুলাই আমাদের কেশব শাখার নতুন ও পুরাতন স্বয়ংসেবকদের একত্রীকরণ হলো। উপস্থিতি ছিল ৬০। বৃষ্টির জন্য আমাদের স্কুলে হলো। শারীরিকের পর বিভাগ কার্যকারিণীর সদস্য আমার দাদু শ্রীনিত্যানন্দ দত্ত তাঁর ভাষণে বললেন, ১৯৬৮ সালে আমাদের এই শাখা শুরু হয়েছে। তখন প্রতিদিন ৬০/৭০ উপস্থিতি থাকতো। প্রতিদিন কবাডি খেলা হতো। বছরে একবার ১৩টি শাখা মিলে লিগ হতো। তাতে আমাদের শাখা চ্যাম্পিয়ন হতো। একবার আমাদের শাখায় ব্যায়ামবীর নীলমণি দাস এসেছিলেন। তিনি আমাদের শাখার খুব প্রশংসা করেছিলেন। জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে আমাদের শাখার প্রায় সবাই সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেছিলেন। আমার বড় দাদু শ্রীগৌরহরি দত্ত ২১ মাস জেলে ছিলেন। এই শাখা থেকে ৬ জন প্রচারক বেরিয়েছেন। আমার বড়দাদু শ্রীঅদ্বৈতচরণ দত্ত এখনো প্রচারক আছেন। আমার জেঠু রতন দত্ত এবং আমার বাবা শ্রীকিঙ্কর দত্ত প্রচারক বেরিয়ে কয়েক বছর ছিলেন। আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম, তখন স্বয়ংসেবকরা রাতে মাঠ পাহারা দিয়ে ধানচোরদের ধরে নিয়ে আসত। ১৯৭৮ সালে বন্যায় স্বয়ংসেবকদের মাটির বাড়ি ভেঙে পড়ে গেলেও সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে বাড়ি বাড়ি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করতে যেত। শ্রীরামমন্দির আন্দোলনের সময় আমাদের শাখা থেকে ২৫ জন করসেবক অযোধ্যায় গিয়ে কারাবরণ করেছিলেন। দাদুর মুখে এসব শুনতে শুনতে আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

শৌর্য্য দত্ত, চতুর্থ শ্রেণী, অভিরামপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

চাষির হাসি

সৌরভ দাস, সপ্তম শ্রেণী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

বর্ষাকাল ধানচাষের কাল
চাষি মনের সুখে চালায় হাল,
ধানগাছ লাগায় সারি সারি
দিনের শেষে ফেরে বাড়ি।

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এলে
ধানগাছ সব দুলে ওঠে,
দুলতে দুলতে বেড়ে ওঠে
চাষির মুখে হাসি ফোটে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

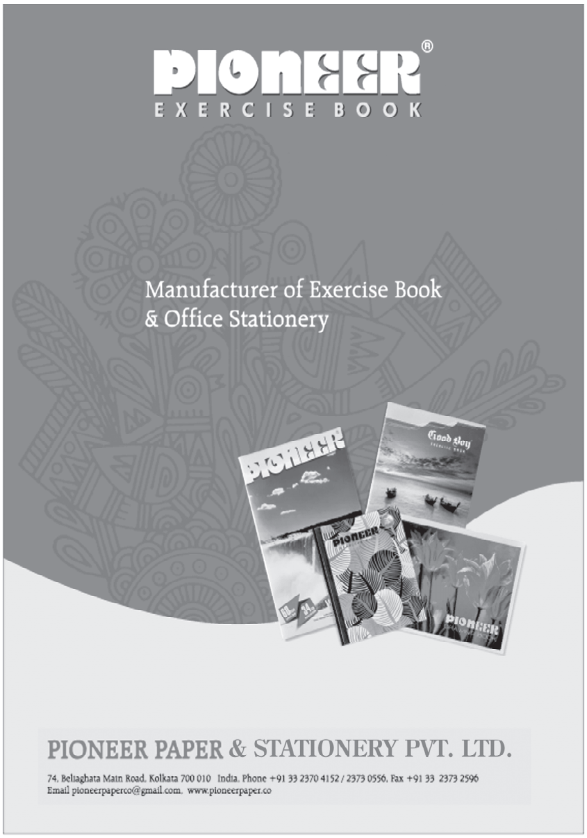

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

★ RETIREMENT PLANNING.
★ CHILDREN EDUCATION FUND.
★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
★ WEALTH CREATION.
★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

ছাত্র আন্দোলনের আড়ালে রাষ্ট্র বিরোধী শক্তির আস্ফালন দেশের পক্ষে বিপজ্জনক

ছাত্রদের নিজেদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করার অধিকার থাকলেও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপ কোনোভাবেই বরদাস্ত নয়।

আনন্দ মোহন দাস

ছাত্ররা তাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ও বিক্ষোভ করবে এটাই গণতান্ত্রিক রীতি। কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের আড়ালে রাষ্ট্র বিরোধী স্লোগান, সাংবাদিক আক্রমণ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ কখনো বরদাস্ত করা যায় না। যে কোনো সমস্যার সমাধান সরকারের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব। কিন্তু সম্প্রতি দিল্লির যন্ত্রমন্তর ও কয়েকটি রাজ্যে ছাত্র আন্দোলনের নামে যেভাবে সাংবাদিক পেটানো, দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়া ও হিংসার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী। দেশের পরিচিত ছাত্র সংগঠনগুলির নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলনের পরিবর্তে ককরোচ জনতা পার্টি নামে একটি নতুন দলের আবির্ভাব ঘটেছে এবং এদের নেতৃত্বেই ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। বিস্ময়কর ভাবে এই দলটির নামের মধ্যে ছাত্র সংগঠনের কোনো চিহ্ন নেই।

অনেকে ভাবছেন ককরোচ জনতা পার্টি নামে একটি দল হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে। কিন্তু একদম ভ্রান্ত ধারণা। এই পার্টির হঠাৎ উদয় হয়নি, এটি একটি পূর্ব পরিকল্পিত আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ককরোচ জনতা পার্টি হলো একটি প্ল্যাটফর্ম। সংবাদে প্রকাশ, গত মার্চ মাসে নরওয়ের সুইডেন শহরে জর্জ সোরসের সংস্থা দ্বারা ২০১৬ সালকে বিশ্বব্যাপী 'প্রতিবাদ বর্ষ' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আবার উদ্দেশ্যমূলক ভাবে সর্বপ্রথম এই প্রতিবাদ আন্দোলন ভারতবর্ষ দিয়ে শুরু করার পরিকল্পনাও হয়েছিল। কীসের স্বার্থে বিদেশের মাটিতে ভারতের ছাত্র আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি হয়েছিল তার তদন্ত প্রয়োজন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশের বিরোধী দলগুলোর ক্ষমতালিপ্সা। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয় কেবলমাত্র একটি বাহানা। ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন বেশিরভাগ দূর দূর পর্যন্ত স্কুল, কলেজ ও নিট পরীক্ষার সঙ্গে কোনো ভাবেই যুক্ত নয়। ভারতে গণঅভ্যুত্থানের অপচেষ্টা ছাড়া এটা অন্য কিছু নয়।

দেশজুড়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে কেন্দ্রীয় সরকারকে অস্থির করা। অভিজিৎ দিপকে, আশুতোষ রাঙ্কা ও সৌরভ দাসের নেতৃত্বে আন্দোলনের পিছনে রাষ্ট্র বিরোধী শক্তির বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। এই

অভিজিৎ দিপকে আমেরিকার বস্টন ইউনিভার্সিটির ছাত্র এবং সৌরভ দাস সুইডেন শহরে জর্জ সোরসের ফান্ডিঙে চলা একটি কোম্পানিতে চাকরি করে বলে জানা গেছে। এখন প্রশ্ন উঠেছে বিদেশে থাকা কোনো একজন কীভাবে ভারতে নীট প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, যাদের নিট পরীক্ষার সঙ্গে বিন্দুমাত্র কোনো সম্পর্ক নেই। ককরোচ পার্টির নেতা মহারাষ্ট্রের অভিজিৎ দিপকে নামে যুবকটি আমেরিকার বস্টনে নাকি জার্নালিজম নিয়ে পড়াশোনা করে। এক সময় আপ পার্টির আইটি সেলের সদস্য ছিল এবং সে আম আদমি পার্টির সঙ্গে যুক্ত বলে জানা যায়। হঠাৎ নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সুযোগ নিয়ে ভারতে এসে ছাত্র আন্দোলনের নামে দেশের মধ্যে অরাজকতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কী? সুতরাং এই সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপক তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রসঙ্গত এই ধরনের প্রশ্ন ফাঁস ভারতে (২০০৬-২০২৪) ১৯ বার হয়েছে, যখন কেন্দ্রে ও রাজ্যে কংগ্রেস বা তাদের সহযোগী দলের সরকার ছিল। সম্প্রতি কর্ণাটক, পঞ্জাব, কেরলম ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেও ককরোচ জনতা পার্টি বিস্ময়কর ভাবে চুপ থেকেছে। প্রভুদের ইশারায় এই সমস্ত রাজ্যগুলির শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে তারা আন্দোলনে শামিল হয়নি। কারণ এই রাজ্যগুলির শাসন ব্যবস্থায় তাদের দোসর কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি ও ইন্ডি জোটের শরিকদল, যারা এই আন্দোলনকে সর্বোতভাবে মদত দিয়েছে। এছাড়াও লাদাখের সোনম ওয়াংচুকও অনশন করে ছাত্র আন্দোলনকে সক্রিয় ভাবে সমর্থন করেছেন। যিনি আন্দোলনের আগে দেশদ্রোহিতা ও ফৌজদারি আইনে অভিযুক্ত হয়ে জামিনে আছেন এবং এই আন্দোলনে সামনের সারিতে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ রয়েছে। নিট প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে ২০ দিন ব্যাপী অনশন করে ছাত্র আন্দোলনে মদত করলেও পরবর্তীতে অনশন প্রত্যাহার করেছেন। সোনম ওয়াংচুক কংগ্রেসি পরিবারের একজন সদস্য। তাঁর বাবা কংগ্রেসের একজন বড়ো নেতা ছিলেন। সোনম ওয়াংচুক লাদাখে শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার ও প্রগতির জন্য SECMOL (Students Educational and Cultural Movement of Ladakh) — HIAL (Himalayan Institute of Alternates Ladakh) নামে ২টি এনজিও তৈরি করেন। ওই সময় জর্জ সোরসের প্রতিনিধি রেবেকা নরম্যান নামে এক আমেরিকান মহিলা সেবামূলক কাজের নামে লাদাখে শিক্ষা ও ধরর্মান্তরণ নিয়ে কাজ করতে থাকেন। ১৯৯৬ সালে সোনম ওয়াংচুক এই আমেরিকান মহিলাকে বিবাহ করেন। এর ফলে তার এনজিও'র মাধ্যমে লাদাখে শিক্ষা সংস্কারের নামে জর্জ সোরসের অর্থ পাওয়া সুবিধা হয়। এছাড়াও তিনি সোরসের ওপেন সোসাইটি ইনস্টিটিউট এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে দেশবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকেন। ইনি ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানে হিমালয়ান ক্লাইমেট কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন এবং লাদাখে ফিরে আসার পরই সেখানে স্বায়ত্তশাসনের নামে দেশবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এছাড়াও চীনের সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। লাদাখ আন্দোলনের সময় তিনি বলেছিলেন যে এবার চীন গালোয়ান উপত্যকায় আক্রমণ করলে লাদাখবাসীরা প্রতিরোধ করবে না। এগুলি কীসের পরিচায়ক? প্রকৃতপক্ষে তার বিরুদ্ধে চীন ও পাকিস্তানের পক্ষে দালালি করার অভিযোগও রয়েছে। সেজন্য সরকার ও দেশবাসীকে এই ধরনের ব্যক্তিদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

অরুন্ধতী রায়, প্রকাশ রাজ, শাবানা আজমি, নাসিরউদ্দিন শাহ, মহম্মদ ইরফান, মহম্মদ জুনেদ, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্র যাদব, আইসার প্রধান-সহ বেশ কিছু মাওবাদী ও সেলিব্রেটিও এই আন্দোলনকে প্রত্যক্ষভাবে মদত দিয়েছে। এই অরুন্ধতী রায় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের আমলে সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে মামলাও চলছে। তিনি কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ স্বীকার করেন না। এই সমস্ত ব্যক্তি সকলেই হিন্দু ও রাষ্ট্র বিরোধী মনোভাব নিয়ে চলেন এবং কথায় কথায় মিথ্যা ন্যারেটিভে সঙ্ঘ ও বিজেপিকে গালাগাল দিয়ে বিষোদ্গার করেন।

বিরোধী দলগুলিও নিট পরীক্ষাকে আঁকড়ে ধরে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছে। সেজন্য বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিতে প্রশ্ন ফাঁস হলেও ছাত্র আন্দোলনের নামে এই ধরনের প্রতিবাদ মিছিল করা হয়নি। এর ফলে ককরোচ পার্টির নেতৃত্বের দ্বিচারিতার নগ্ন চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

দেখা গেছে দিল্লির যন্ত্রমন্তর ও অন্যান্য রাজ্যে ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই নয় এবং অনেকেই রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে নিট আন্দোলনের আশ্রয় নিয়েছে। এমনকী বিঘটনকারী শক্তিগুলিও হিংসার আশ্রয় নিয়ে আন্দোলনে দেশবিরোধী স্লোগান তুলেছে। এরা কোনোভাবেই নিট সংক্রান্ত পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত নয়। দেখা গেছে এই ছাত্র আন্দোলনে প্রকৃত ছাত্রের সংখ্যা ২৫ শতাংশের বেশি নয়। এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীকে ভুল পথে পরিচালিত করতে বিরোধী দল-সহ বিদেশি সাহায্য পুষ্ট এনজিওগুলি পুরো মাত্রায় মদত দিয়েছে। কারণ ভারতবর্ষে হিন্দুত্ববোধ সম্পন্ন একটি রাষ্ট্রভক্ত সরকার থাকার ফলে বিদেশি শক্তিগুলির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এছাড়াও আরেকটি কারণ হলো বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত কঠোর FCRA-2 বিল। এর ফলে বিশেষ করে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের এনজিওগুলি বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে বিপদের আশঙ্কায় মাঠে নেমে পড়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে ইউএস কংগ্রেসম্যান রিলি মুরি FCRA-2 বিলের বিরোধিতা করে বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি মিথ্যা অভিযোগ করেছেন যে ভারত সরকার এই বিল দ্বারা খ্রিস্টান মিশনারিদের কর্মকাণ্ড ও চার্চগুলি বন্ধ করে দেবে। FCRA-2 বিলের বিরুদ্ধে আমেরিকান কংগ্রেসের সদস্যের প্রতিবাদ ভারতের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়। এই বিলের বিরুদ্ধে

খ্রিস্টান মিশনারি ও মুসলমান মোল্লাবাদীরাও সরকারের কাছে প্রতিবাদ করে এই বিলের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দিয়েছেন।

তাই ছাত্র আন্দোলনে রাষ্ট্র বিরোধী শক্তিগুলি যৌথভাবে অর্থ-সহ বিভিন্ন ভাবে আন্দোলনে মদত জুগিয়েছে এবং দেশে নৈরাজ্য ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হয়েছে। দেশে ৩৭ লক্ষ রেজিস্টার্ড এনজিও রয়েছে। অথচ দেশে স্কুলের সংখ্যা ১৯ লক্ষ রয়েছে। ২০২৪ সালে মাত্র ৬ লক্ষ এনজিও তাদের অডিট রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। কিন্তু বাকি ৩১ লক্ষ এনজিও বেআইনি ভাবে বর্তমান FCRA আইনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিদেশি অর্থের অপব্যবহার করছে। কোনোরকম অডিট ও হিসেবপত্র নেই বলে কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর আইন করতে সংসদে FCRA-2 বিল পাশ করানোর প্রস্তাব রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত বিদেশি সাহায্য পুষ্ট এনজিওর মাধ্যমে শিক্ষা ও সেবার আড়ালে বেআইনি ধর্মান্তরণের মাধ্যমে দেশ বিরোধী কার্যকলাপ সংঘটিত হয়।

নিটের প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকলে ছাত্ররা আন্দোলন করতেই পারে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে ৭৫ শতাংশ আন্দোলনকারী ছাত্র নয়। এই ৭৫ শতাংশ কারা? এদের দ্বারাই কি ছাত্র আন্দোলনে বিচ্ছিন্নতাবাদী স্লোগান উঠেছে, 'ভারত তেরে টুকরা হোঙ্গে, ইনসাআল্লাহ, ইনসাআল্লাহ', 'কাশ্মীর মাগে আজাদি', কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা ফেরাতে হবে, ভারতমাতা হলে, বাবা কে? উমর খালিদের মুক্তি চাই ইত্যাদি। মিছিলে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে কুকুচিকর স্লোগান এবং প্রধানমন্ত্রীর অশ্লীল ছবি প্রদর্শন। এমনকী দেশে বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ করে সুপ্রিম কোর্টকে পর্যন্ত প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করাও হয়েছে। দেশবিরোধী স্লোগান উঠেছে। এর সঙ্গে নিট আন্দোলনের কী সম্পর্ক? নিটের প্রশ্ন ফাঁস তো একটি বাহানা মাত্র। প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো গণতান্ত্রিক পথে নির্বাচিত সরকারকে বাংলাদেশ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার মতো জঙ্গি আন্দোলনের মাধ্যমে গদিচ্যুত করে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করা।

এর পিছনে একটি নির্দিষ্ট ইকোসিস্টেম কাজ করছে। বাম, অতিবাম, আরবান নকশাল, ইসলামিক ও খ্রিস্টান শক্তি, কংগ্রেস, তৃণমূল, আপ পার্টি, কিছু সাংবাদিক এবং বেশ কিছু এনজিও এই ইকো সিস্টেমের অঙ্গীভূত। এদের মাধ্যমে বিভিন্ন মিথ্যা ন্যারেটিভ তৈরি করে দেশে বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় ছাত্র আন্দোলনের ভিড়ে পার্ক সার্কাস, মেটিয়াবুরুজ, রাজাবাজার, বেকবাগান, কলাবাগান ও তপসিয়া থেকে মুসলমান গুন্ডারা কাদের উসকানিতে গদি মিডিয়া আওয়াজ তুলে বেপরোয়া হয়ে সাংবাদিক ও পুলিশকে পেটাল? এই মিছিল থেকে কীভাবে দেশবিরোধী স্লোগান উঠল। প্রতিবাদের নামে প্রধানমন্ত্রীর কুরুচিকর ছবির পোস্টার নিয়ে আন্দোলন কি ছাত্র আন্দোলনের নমুনা?

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর দিল্লির পাঁচতারা হোটেলে ছাত্ররা ফুর্তি করে ন্যক্কারজনক আচরণের হেতু কি শুধুমাত্র শিক্ষামন্ত্রীর পদতাগ না অন্য কিছু। এটাই কি ছাত্র আন্দোলনের উদ্দেশ্য? পাঁচতারা হোটেলের খরচের পিছনে কে? তার তদন্ত হওয়া দরকার। কারণ ছাত্র আন্দোলনকে ঢাল করে বিদেশি শক্তির আর্থিক মদত বরদাস্ত নয়। তদন্তে দেখা গেছে বেশ কিছু আন্দোলনকারী ধর্ষণ, হত্যা ও ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত রয়েছে। আন্দোলনকারীদের নেতারা এর দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। অভিযোগ উঠেছে এই আন্দোলনের পিছনে পাকিস্তান, ইসলামিক শক্তি, আমেরিকা ও চীনের সমস্ত রকম মদত রয়েছে। কারণ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের উত্থান ওই সমস্ত দেশগুলি ভালো ভাবে নিতে পারছে না। শক্তিশালী ভারত গঠনে বিশ্বের চতুর্থ আর্থিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পদক্ষেপে এই সমস্ত দেশগুলির ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এদের অবিক্রিত পণ্যগুলি ভারতে মতো বিশাল বাজারে বিক্রি করার সুযোগ না পাওয়া। দেশের কৃষকের স্বার্থ ও দেশীয় পণ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য ভারতের বর্তমান সরকারের ভূমিকা এরা ভালো ভাবে নেয়নি। তাই আমেরিকা এখনো পর্যন্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে দ্বিধা করছে। সম্প্রতি জাপান, ফ্রান্স রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী সদস্য পদের পক্ষে সওয়াল করলেও আমেরিকা বিরোধিতা করেছে এবং চীন কোনো রকম ভোটদানে বিরত থেকেছে। কারণ উভয় দেশ ভারতকে দুর্বল করতে মাঠে নেমেছে। কখনো চায় না ভারত শক্তিশালী হোক।

নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের মতো ভারতেও জঙ্গি ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের বাসনায় ককরোচ জনতা পার্টির আবির্ভাব ঘটেছে। ওই তিনটি দেশেও বিদেশি শক্তি ছাত্রদের আর্থিক মদত দিয়ে সে দেশের সরকারকে পরিবর্তন করে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে উদ্যোগী হয়েছিল। কারণ এদের ব্যবসা সম্প্রসারণ ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বার্থের কোনো ব্যাঘাত ঘটলে সেই দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেওয়ার চক্রান্ত করে থাকে। ভারতেও একই ভাবে ডিপ স্টেটের মদতে ছাত্র আন্দোলনকে হাতিয়ার করে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা। এরা জানে যে মোদীর নেতৃত্বে ভারত ক্রমশ একটি আত্মনির্ভরশীল শক্তিশালী দেশ হিসেবে এগিয়ে চলেছে। আর্থিক ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বে চতুর্থ স্থানে পৌঁছে গেছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমদানির পরিবর্তে দেশ রপ্তানি শুরু করেছে। দেশীয় ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং সস্তায় জেনিরক ওষুধ সরবরাহ করতে সারা দেশে প্রদানমন্ত্রী জনঔষধি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বিদেশি ওষুধ কোম্পানিগুলিও ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপে রয়েছে। তাই এই ধরনের বিদেশি শক্তিগুলি নানাভাবে সরকারকে বিব্রত করার প্রয়াস চালিয়ে যাবে। বলা বাহুল্য ছাত্রদের নিজেদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করার অধিকার থাকলেও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপ কোনোভাবেই বরদাস্ত নয়। তাই সরকারকে এবিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। □

অতিথি কলম

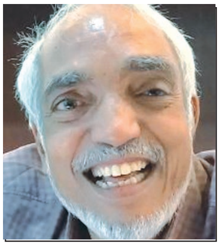

কে এ বদরিনাথ

ককরোচ আন্দোলনের বাস্তবতা

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের নেপথ্যে অপরাধ ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের চোরাস্রোত

ভারতের মতো একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বিকাশমান দেশে তরুণ প্রজন্মের ক্ষোভ, প্রত্যাশা এবং তা সমাধানের সমস্যা থাকা স্বাভাবিক। তবে সেই ক্ষোভকে অস্ত্র করে দেশের স্থিতিশীলতা বিনষ্টের চক্রান্ত বন্ধ করতে আরও প্রাতিষ্ঠানিক সক্রিয়তা প্রয়োজন।

নয়াদিল্লির ঐতিহ্যবাহী যন্তরমন্তরে অনুষ্ঠিত ৪৯ দিনব্যাপী উত্তাল ছাত্র আন্দোলনটি বাহ্যিক চোখে জাতীয় চিকিৎসক প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের এক স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ মনে হলেও, এর গভীরে নিহিত রয়েছে এক সুদূরপ্রসারী ও জটিল চক্রান্ত। ঘটনা প্রবাহের সত্যতা অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, পরীক্ষা ব্যবস্থার অসঙ্গতিতে বিক্ষুব্ধ সাধারণ শিক্ষার্থীদের আড়াল করে আন্দোলনটিকে এক বিপজ্জনক অরাজকতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল কুখ্যাত ইসলামপন্থী, মাওবাদী, চরমপন্থী, দাগি অপরাধী এবং দেশি-বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত একশ্রেণীর বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)। প্রশ্ন উঠছে, অপরাধের ইতিহাস থাকা হাজারো ব্যক্তি, উগ্র বামপন্থী ও সাম্প্রদায়িক ইসলামপন্থীরা কীভাবে একই মঞ্চে একত্রিত হলো? আর এই পুরো নাটকের নেপথ্য পরিচালকই-বা কে?

'ককরোচ জনতা পার্টি'র ব্যানারে সংগঠিত এই আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, এটি কেবল শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতার প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ ছিল না। কয়েক হাজার শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের উদ্বেগের বিষয়টি নিঃসন্দেহে আন্তরিক ও বস্তুনিষ্ঠ বিষয়; কিন্তু আন্দোলনের একটি বিরাট অংশের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের নির্বাচিত রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি বিনষ্ট করা। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার আন্দোলনকারীরা শেষপর্যন্ত তাঁর পদত্যাগ নিশ্চিত করলেও, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সব সমস্যা কি তাতে মিটে গেছে? গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালের আগে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যে অন্তত ৪৬টিরও বেশি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছিল। তৎকালীন সময়ে কি কোনো শিক্ষামন্ত্রীদের পদত্যাগের দাবি কিংবা তথাকথিত শিক্ষা দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নজির তৈরি করা হয়েছিল? বস্তুত, বর্তমান সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থা শুদ্ধীকরণের প্রয়াসকে অসৎ ভাবে ব্যবহার করতেই শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের এই কৌশলগত দাবি তোলা হয়েছিল। আন্দোলনের জেরে রাজধানী অচলাবস্থায় পড়ে এবং উগ্র ও সমাজবিরোধীরা রাজপথের দখল নিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। ইনস্টাগ্রাম-সহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে আন্দোলনকে উসকে দেওয়া এই তথাকথিত 'ককরোচ' গোষ্ঠী প্রশাসনের উপর এমন চাপ সৃষ্টি করে, যে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের এক অংশ তথ্যের যথার্থতা যাচাই করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইতস্তত বোধ করেন।

দিল্লি পুলিশের 'ক্রাইম কুণ্ডলী' ডেটাবেস এবং তাদের সর্বাধুনিক 'মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ প্রযুক্তি'র মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য এই আন্দোলনের এক অবিশ্বাস্য চিত্র উন্মোচন করেছে। সর্বাধিক প্রায় ২০ হাজার মানুষের এই জমায়েতে অন্তত ২,৮৭৩ জন ব্যক্তি ছিলেন সরাসরি অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে হত্যা, ডাকাতি, সশস্ত্র লুটপাট, নারী নির্যাতন, মাদক পাচার, বেআইনি অস্ত্র ব্যবসা, ছিনতাই ও অপহরণের মতো গুরুতর অপরাধে অভিযুক্তরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর পরিকল্পিত হামলার ঘটনাও ঘটে। যদিও সমালোচকেরা দিল্লি পুলিশের এই তথ্যভাণ্ডারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে, দিল্লি পুলিশের এই প্রয়াশকে কালিমালিপ্ত করার চক্রান্ত হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে অপরাধ সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের মতে 'ক্রাইম কুণ্ডলী' দিল্লির অন্যতম বৈজ্ঞানিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যভাণ্ডারের একটি। এত বিশাল সংখ্যক অপরাধীকে কে বা কারা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত করল এবং কার স্বার্থে তাঁদের ব্যবহার করা হলো, সে প্রশ্নের আজও উত্তর পাওয়া গেল না।

এই আন্দোলনের নেপথ্যে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ও বিদেশি মদতের জোরালো ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। দুবাই-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'অ্যাব্রেকো ফ্রেইট'-এর মালয়ালি ব্যবসায়ী মোহাম্মদ শাজি, যিনি নিজে সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন আইনি জটিলতায় লিপ্ত, তিনি হাজার হাজার ডলার ব্যয় করে তাঁর প্রতিষ্ঠানের ২৩ জন কর্মীকে ভারতে পাঠান এই 'ককরোচ' আন্দোলনে যোগ দিতে। তিনি কর্মীদের সমস্ত যাতায়াত খরচ ও অতিরিক্ত আর্থিক অনুদান প্রদান করে আন্দোলনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন বলে জানা যায়। এই আন্তর্জাতিক যোগসূত্রের গভীরতা অনুসন্ধান দেশের নিরাপত্তার স্বার্থেই জরুরি হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে, আন্দোলনের সহিংস মোড় নেওয়ার পেছনে ভীম আর্মি এবং তার প্রধান, নাগিনা লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ চন্দ্রশেখর আজাদের ভূমিকা বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। চন্দ্রশেখর আজাদ কেবল অভিজিৎ দিপ্‌কের নেতৃত্বাধীন সিজিপি-কে সমর্থনই জানাননি, বরং সংসদ ভবনের ভেতরে ও বাইরে অবস্থান কর্মসূচিতে সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একজন প্রতিনিধির নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রকাশের অধিকার থাকলেও, 'শান্তিপূর্ণ' আন্দোলনের আড়ালে বিভাজনমূলক ও সাম্প্রদায়িক অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে ভীম আর্মি পার্টির কর্মী, অর্থ ও যোগাযোগ সহায়তা আন্দোলনকে অরাজকতার দিকে চালিত করে। কালক্রমে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি মোদী সরকার, ভারতদেশ এবং সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এক সমন্বিত অপপ্রচারে পরিণত হয়। আন্দোলনের সহিংসতার দায় দেশের ওপর চাপানোর অপচেষ্টা চালানো হলেও, বাস্তবে অরাজকতা সৃষ্টিতে তাঁদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য।

বর্তমান ভারতবর্ষে ম্রিয়মাণ বাম-চরমপন্থীদের উত্থানের চেষ্টা হিসেবে এই আন্দোলনকে ব্যবহার করা হয়েছে। মাওবাদী অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয়তাও এই আন্দোলনে নজর কেড়েছে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ)-সহ দিল্লির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উগ্র বামপন্থী তরুণদের সংগঠিত করে রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালায় এশিয়া নামক সংগঠনটি। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির কর্মী সংগ্রহের কেন্দ্র হিসেবে গঠিত এশিয়া এবং 'পিপলস ওয়ার গ্রুপে'র 'র‍্যাডিক্যাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন'-এর পুনরুত্থান ঘটানোর এই চেষ্টা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে এশিয়া কর্মীদের অনশন কর্মসূচিতে যোগদান এবং উগ্র মাওবাদী ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা আসলে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে এক ছদ্ম-সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা। এমনকী সিপিআই (এমএল)-লিবারেশনের নেহা ও তার সহযোগীদের মাধ্যমে সরকারের মাওবাদী দমন অভিযানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চাপ তৈরির একটি সুযোগ হিসেবে যন্তরমন্তরের মঞ্চকে ব্যবহার করা হয়েছে।

উগ্র ইসলামপন্থী দল ও আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্কের সমীকরণ এই আন্দোলনকে আরও জটিল করে তোলে। আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামির অস্বাভাবিক সক্রিয়তা এবং পাকিস্তানকেন্দ্রিক সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে পরিচালিত আন্তর্জাতিক প্রচারের আন্তর্জাতিক চক্রান্তের চালচিত্রটি স্পষ্ট করে। নয়াদিল্লিতে আন্দোলনকারীদের জন্য বিরিয়ানির বিশালাকার আয়োজন, তাঁবু, পানীয় জল ও পরিবহণ খরচের সিংহভাগ এসেছে দুবাই-ভিত্তিক বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার কাছ থেকে। সিজেপি-র আর্থিক উৎসের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বিস্তৃত তদন্ত প্রয়োজন।

সবশেষে, উগ্র রক্ষণশীল খ্রিস্টানগোষ্ঠী ও বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত এনজিওগুলির উপস্থিতি আন্দোলনটিকে নতুন মাত্রা প্রদান করে। ক্যাথলিক বিশপস কাউন্সিল এবং বিভিন্ন প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছাড়াও বার্লিন, লন্ডন ও ওয়াশিংটন ডিসিতে একযোগে প্রতিবাদ কর্মসূচি আয়োজন এক গভীর আন্তর্জাতিক চক্রান্তের ইঙ্গিত দেয়, যার নেপথ্যে 'ডিপ স্টেট'-এর মতো অদৃশ্য হাত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ভারতের মতো একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বিকাশমান দেশে তরুণ প্রজন্মের ক্ষোভ, প্রত্যাশা এবং তা সমাধানের সমস্যা থাকা স্বাভাবিক। তবে সেই ক্ষোভকে অস্ত্র করে দেশের স্থিতিশীলতা বিনষ্টের চক্রান্ত বন্ধ করতে আরও প্রাতিষ্ঠানিক সক্রিয়তা প্রয়োজন। নন্দন নিলেকানির নেতৃত্বাধীন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিকে প্রযুক্তিনির্ভর, দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা সংস্কারের বাস্তবসম্মত রূপরেখা উপস্থাপন করতে হবে, যাতে তরুণদের ভবিষ্যৎ কোনো কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর হাতছানিতে বিনষ্ট না হয়।

(লেখক সেন্টার ফর ইনটিগ্রেটেড অ্যান্ড হোলিস্টিক স্টাডিজের ডিরেক্টর ও চিফ এক্সিকিউটিভ)

শোকসংবাদ

বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ খণ্ডের হেত্যাপাথর শাখার প্রয়াত স্বয়ংসেবক করালীচরণ মাহাতর ধর্মপত্নী শেফালী মাহাত গত ২ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর পরিবারের সকলেই স্বয়ংসেবক। তাঁর পৌত্র কপিলদেব মাহাত দক্ষিণ বাঁকুড়া জেলার সহ শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখের দায়িত্ব পালন করছেন।

* * *

দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর এলাকার সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী তথা যাদবপুর বিদ্যাসাগর সংস্কার ভারতীয় সদস্যা বাবলি চক্রবর্তী গত ২৭ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি বিশিষ্ট সঙ্গীত শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতনিকে রেখে গেছেন।

গ্লাসগোয় ভারতের ঐতিহাসিক অভিযান

নিলয় সামন্ত

কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ ভারতের অভিযান শেষ হলো এক ঐতিহাসিক সাফল্যের মধ্য দিয়ে। স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় অনুষ্ঠিত এই আসরে ভারত মোট ৩৯টি পদক জিতে দেশের ক্রীড়া ইতিহাসে আরও একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করল। ভারতের ঝুলিতে এসেছে ১৩টি স্বর্ণ, ১৭টি রৌপ্য এবং ৯টি ব্রোঞ্জ পদক। নানা খেলায় ধারাবাহিক সাফল্যের পাশাপাশি একাধিক নতুন রের্কড গড়ে ভারতীয় ক্রীড়াবিদেরা ভবিষ্যতের জন্যও উজ্জ্বল বার্তা দিলেন।

এই আসরে ভারতের সবচেয়ে বড়ো শক্তি ছিল বক্সিং। প্রথমবারের মতো একটি কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের ১০ জন বক্সার পদক জিতলেন। তাঁদের মধ্যে সাতজন স্বর্ণপদক জয় করে দেশের বক্সিং ইতিহাসে নতুন মাইলফলক স্থাপন করেন। আরও তিনজন জেতেন রৌপ্য পদক। নারী ও পুরুষ— উভয় বিভাগেই ভারতীয় বক্সারদের দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো।

ভারোত্তোলনেও ভারতীয় ক্রীড়াবিদেরা দারুণ সাফল্য পান। মীরাবাই চানু টানা তৃতীয় কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। তাঁর পাশাপাশি আরও সাতজন ভারতীয় ভারোত্তোলন পদক জয় করেন। এই বিভাগে ভারতের মোট সংগ্রহ একটি স্বর্ণ, ছয়টি রৌপ্য এবং একটি ব্রোঞ্জ। অ্যাথলেটিক্স ও প্যারা অ্যাথলেটিক্সেও ভারত দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দেয়। এই দুই বিভাগ মিলিয়ে ভারত জেতে মোট ১৬টি পদক, যার মধ্যে রয়েছে তিনটি স্বর্ণ, সাতটি রৌপ্য এবং ছয়টি ব্রোঞ্জ। তেজস্বিন শঙ্কর পুরুষদের ডেকাথলনে ব্রোঞ্জ জিতে কমনওয়েলথ গেমসের ইতিহাসে প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই ইভেন্টে পদক জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেন। অন্যদিকে গুলবীর সিংহ একই আসরে ৫ হাজার মিটার ও ১০ হাজার মিটারে পদক জিতে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সে নতুন নজির গড়েন।

জুডোতেও ভারতের সাফল্য ছিল উল্লেখযোগ্য। অস্মিতা দে এবং হর্ষ সিংহ স্বর্ণপদক জয় করেন। যামিনী মৌর্য রৌপ্য এবং উন্নতি শর্মা ব্রোঞ্জ জিতে ভারতের পদকসংখ্যা আরও সমৃদ্ধ করেন।

ভারতের পদকজয়ীদের তালিকায় রয়েছেন ঝান্ডু কুমার (ব্রোঞ্জ, প্যারা পাওয়ারলিফটিং); ঋষিকান্ত সিংহ (রৌপ্য, ভারোত্তোলন); মীরাবাই চানু (স্বর্ণ, ভারোত্তোলন); মুথুপান্ডি রাজা (রৌপ্য, ভারোত্তোলন); জ্ঞানেশ্বরী যাদব (রৌপ্য, ভারোত্তোলন); বিন্দিয়ারানি দেবী (ব্রোঞ্জ, ভারোত্তোলন); শর্মিলা ধনকার (স্বর্ণ, প্যারা অ্যাথলেটিক্স); সর্বেশ কুশারে (রৌপ্য, হাই জাম্প); শিল্পা কে শায়লা (ব্রোঞ্জ, প্যারা অ্যাথলেটিক্স); ভাল্লুরি অজয় বাবু (রৌপ্য, ভারোত্তোলন); হরজিন্দর কৌর (রৌপ্য, ভারোত্তোলন); গুলবীর সিংহ (রৌপ্য, ১০ হাজার মিটার); মুরলী শ্রীশঙ্কর (রৌপ্য লং জাম্প); দিলীপ গাভিত (স্বর্ণ, প্যারা অ্যাথলেটিক্স); মোহাম্মদ বাসিল (রৌপ্য, প্যারা অ্যাথলেটিক্স); লভপ্রীত সিংহ (রৌপ্য, ভারোত্তোলন); সীমা কালিরামনা (ব্রোঞ্জ, ডিসকাস থ্রো); অস্মিতা দে (স্বর্ণ, জুডো); হর্ষ সিংহ (স্বর্ণ, জুডো); সাক্ষী চৌধুরী (স্বর্ণ, বক্সিং); প্রিয়া ঘাংঘাস (স্বর্ণ, বক্সিং); অরুন্ধতী চৌধুরী (স্বর্ণ, বক্সিং); লভলিনা বরগোহাঁই (রৌপ্য, বক্সিং); সচিন সিওয়াচ (স্বর্ণ, বক্সিং); অঙ্কুশ পাংঘাল (স্বর্ণ, বক্সিং); নরেন্দর বেরওয়াল (রৌপ্য, বক্সিং) এবং গুলবীর সিংহ (ব্রোঞ্জ, ৫ হাজার মিটার)।

গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬ ভারতের জন্য শুধু পদকের নিরিখেই সফল নয়, বরং নতুন প্রতিভার উত্থান, বহু ঐতিহাসিক কৃতিত্ব এবং বিভিন্ন খেলায় ধারাবাহিক উন্নতির এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। অলিম্পিকের প্রস্তুতির পথে এই সাফল্য ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গনকে নতুন আত্মবিশ্বাস এবং আরও বড়ো স্বপ্ন দেখার অনুপ্রেরণা দিল। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৯৩)

কষ্ট ও কৌতুক

অসুস্থ অবস্থায় ডাক্তারজীর শারীরিক কষ্ট ছিল অবর্ণনীয় কিন্তু অসীম সহ্য ক্ষমতার গুণে তিনি বেশিরভাগ সময়ই কাউকে কিছু বলতে দিতে চাইতেন না। কিন্তু আশ্চর্য তখন হতে হয় যখন দেখি এই কষ্টের মধ্যেও তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ কৌতুকপ্রিয়তা থেকে কখনো দূরে সরে যাননি। রাজগিরেতে ডাক্তারজী তখন উষ্ণ প্রস্রবণের ধারায় নিত্য বেশ কিছু সময় স্নান করে সুস্থ থাকার চেষ্টা করেছিলেন। এই সময়ে মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্বয়ংসেবক তাঁর আবাস স্থানে দেখা করতে আসতো। সেদিন স্নানান্তে বাড়ি ফিরে লম্বা কোট, দস্তানা, পায়ে মোজা, মাথায় লম্বা টুপি পরে ডাক্তারজী বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। এমন সময় কুড়ি-পঁচিশ জন স্বয়ংসেবক সিঁড়ির নীচে দাঁড়ালো। ডাক্তারজী তাদের জিজ্ঞেস করলেন—

—কোথা থেকে এসেছেন?

—গয়া থেকে।

—কী কাজে এসেছেন?

—ডাক্তার হেডগেওয়ারের সঙ্গে দেখা করতে। তাদের মধ্যে থেকে একজন উত্তর দিল।

'ঠিক আছে। তিনি ভেতরে বসে লিখছেন'— এই বলে ঘরে আপ্পাজীর দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। সকলে ঘরে প্রবেশ করে আপ্পাজীকে প্রণাম করে দাঁড়াল। হঠাৎ এমন অবস্থায় আপ্পাজী আশ্চর্য হয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলেন—

—আমাকে নমস্কার করছ কেন?

—আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।

—কাকে দর্শন করতে এসেছো?

আপ্পাজীর প্রশ্নে তারা বললো— 'ডাক্তারজীর সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন স্বয়ংসেবক আপনাকে দেখিয়ে দিলেন'।

—একথা শুনে, আপ্পাজী হো হো করে হেসে উঠলেন আর বললেন— 'বাঃ বেশ। আরে উনি শুধু স্বয়ংসেবক নন, উনিই ডাক্তার হেডগেওয়ার।' ডাক্তারজী মজা করেছেন বুঝতে পেরে সবাই বাইরে এলে হাসি ও আনন্দের এক পরিবেশ সৃষ্টি হলো। ডাক্তারজীর সঙ্গে সকলের অনেক কথা হলো। ডাক্তারজীর বিনোদনের এই সহজ ভঙ্গিমায় সকলের সঙ্গে ডাক্তারজীও কম আনন্দিত হননি।

পুনার 'নতুন মারাঠি বিদ্যালয়'-এ সঙ্ঘের বর্গ চলছিল। ডাক্তারজীর অসুস্থতার মধ্যে তখন বড়ো সমস্যা ছিল প্রচণ্ড ঘাম, পিঠের বাঁ দিকে অত্যধিক ব্যথা, আর সামান্য কাজেই খুব ক্লান্তি। এই ব্যথার জন্য গরমেও উলের সোয়েটার পড়তে হতো। বর্গে থাকাকালীন সুবিধার জন্য ডাক্তারজী প্রতিদিন সকালে বিদ্যালয়ের পেছনে যোগেশ্বরী গলিতে স্বয়ংসেবক শ্রীনানা ঘানেকরের বাড়িতে স্নান করতে যেতেন। ঘামে ভেজা কাপড়গুলি ধুতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিঠে ব্যথার জন্য কর্পূরতেল মালিশ করতে হতো। কিন্তু কোনো স্বয়ংসেবক মালিশ করে দিতে চাইলে তিনি বলতেন— 'ব্যথার জায়গায় কত জোরে চাপ দিয়ে মালিশ করতে হবে তা তুমি অনুমান করতে পারবে না, ভাই মালিশ আমাকেই করতে দাও'। নিঃসঙ্কোচতা, সহজতা ছিল ডাক্তারজীর অন্যতম গুণ। প্রথম দিনেই স্নানের পরে শ্রীনানা ঘানেকরের স্ত্রী ডাক্তারজীকে কেশর ও বাদাম মেশানো দুধ পান করার জন্য দিলেন। দুধ পান করার সময় ডাক্তারজী হেসে বললেন— 'খুব ভালো দুধ দিয়েছ কিন্তু দুধ পান করার পর আমার বড়ো বড়ো গোঁফগুলোকে ধোওয়ার জন্য জল দিতেই ভুলে গেছ।' এ কথা শুনে সবার মধ্যে হাসির রোল ওঠাই ছিল স্বাভাবিক।

সমস্ত পরীক্ষনিরীক্ষা শেষে ডাক্তারজীকে ১৮ জুন (১৯৪০) শ্রীবাবাসাহেব ঘটাটের বাংলোয় আনা হলো— এখানে সঠিক সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হবে এই ভেবে। কিন্তু সবকিছু ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারজীর ব্যথা, অস্থিরতা কিছুই কম ছিল না। যার জন্য বেশিরভাগ সময় ঘরে পায়চারি করতেন। বেশি কষ্ট হলে বাইরে বাগানে এসে বসতেন। রাতে ঘুম হতো না। সেজন্য তখনও এদিক-ওদিক হাঁটা হাঁটি করতেন। এভাবে ঘোরাফেরা করলে শরীর আরও ক্লান্ত হয়ে পড়বে তাই সেবা কাজে নিয়োজিত স্বয়ংসেবকদের অনেক সময় বলতে হতো— 'দরজার বাইরে বেরোবেন না'। এই বলাটা খুবই কঠিন ছিল আর ডাক্তারজীরও যে খুব পছন্দ হতো তা না। কিন্তু কী করবেন। এরকম অবস্থায় একবার শ্রীগুরুজী তাঁর কাছে এলে হাসতে হাসতে শ্রীগুরুজীকে বললেন— 'আপনি আমার কাছে অ্যাটেনডেন্ট রেখেছেন না আমাকে আটকাবার জন্য পালোয়ান?' সত্যিই এমন অবস্থায় এমন রসিকতাপূর্ণ কথা, কল্পনা করা যায় না।

সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩৩

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

থাকছে

দেবী প্রসঙ্গ, উপন্যাস,
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোটো গল্প
প্রবন্ধ

সত্বর আপনার কপি বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা